দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

মান্যবর শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণ

বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সাল

১লা বৈশাখ।

সূচী

প্রদর্শনীর কার্য্যবিবরণী	...	...	...	৶৹
মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোট লাট মহোদয়ের অভিভাষণ			...	৷৶৹
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ		...	...	১
মূল সভাপতির অভিভাষণ	...	...	...	১৪
সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ		...	...	৩৯
দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ		...	...	৮৯
ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ		...	...	১৬১
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ		...	...	১৭৩
কার্য্যবিবরণী ...	...	...	...	২০৫

চিত্রসূচী

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোট লাট মহোদয়		...	...	মুখপত্র
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি	...	...	..	১
মূল সভাপতি ...	...	...	...	১৪
সাহিত্য-শাখার সভাপতি	...	...	...	৩৯
দর্শন-শাখার সভাপতি ...	...	...	...	৮৯
ইতিহাস-শাখার সভাপতি	...	...	...	১৬১
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি	...	...	...	১৭৩
প্রতিনিধিবর্গ ...	...	...	...	২০৫
স্বেচ্ছা-সেবকবৃন্দ ...	...	...	...	২২৫

দশমবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

প্রদর্শনী

প্রদর্শনী

যদিও বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের সময় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত স্বতন্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথমে বাঁকিপুরেই সংঘটিত হয়। ইহা দশম সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। অধিকন্তু, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মহামান্যবর ছোটলাট, সুপণ্ডিত স্যার এডোয়ার্ড গেট কে. সি. এস. আই.; সি. আই. ই মহোদয় এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়া বঙ্গসাহিত্যসেবিবৃন্দকে যে যৎপরোনাস্তি সম্মানিত করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য।

"মোবারক লজ নামক উদ্যান বাটীকায় এই প্রদর্শনীর স্থান হইয়াছিল। স্থানটী পত্র, পুষ্পে, পতাকায়, বহুমূল্যবান চন্দ্রাতপ দ্বারা সুসজ্জিত এবং মধ্যস্থলে মান্যবর শ্রীযুক্ত ছোটলাট মহোদয়ের জন্য রৌপ্য-সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল। শহরের ও মফঃস্বলের সরকারী ও বেসরকারী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি দেখিবার জন্য সমবেত হইয়া পরিচালকবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মহামান্য ছোটলাট মহোদয় স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর সংগৃহীত অনেকগুলি দ্রব্য, উক্ত সমিতির জএণ্ট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যজ্ঞিয় পাত্র, পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় বঙ্গীয় ধর্ম্মাঙ্কুর সভার লঙ্কা ও ব্রহ্ম প্রদেশের বহু প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তিব্বতীয় পুঁথি,

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মূল্যবান পুঁথি, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। স্থানীয় অনেকে নিজ নিজ সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া প্রদর্শনীর সফলতার সহায়তা করিয়াছিলেন।

নির্দ্ধারিত সময়ে মহামান্য লাট মহোদয়, প্রধান সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুক্ত ম্যাকফরসন সাহেব সহ প্রদর্শনীর দ্বারে উপনীত হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মান্যবর রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া প্রবেশ ও আসন গ্রহণ করিলে মান্যবর রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় নিম্নোক্ত বক্তৃতা করিয়া শ্রীযুক্ত লাট মহোদয়কে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

"Your Honour,—Under the rules of the Bengal Literary Conference, an exhibition has to be held every year. So long, the exhibition occupied a subordinate position, and no separate function was performed in this connexion. We, in this rich storehouse of antiquities, in this seat of ancient learning, have thought it fit to give greater importance to the exhibition and to make it a prominent feature of the Annual Literary Conference. We moved about, and have got a hearty response from some of the ancient and historic families of Patna. This encouraged us to think of formally opening the exhibition, and our thoughts naturally turned to the distinguished savant

and scholar of antiquities who rules this province. We had grave doubts in our minds whether we could make our humble endeavour worthy of Your Honour's association with it. But the ready response we got from your Honour has filled our hearts with sincere and deep feelings of gratitude and has laid the whole Bengalee community under an abiding sense of obligation. Professors Jadu Nath Sarkar and Jogindranath Samaddar have spared no pains to find out the collections and to make them a decent one. The thanks of the Reception Committee are due to all who have lent us the exhibits and to Your Honour, who has condescended to open formally what is practically the first serious and varied exhibition in connection with the Bengali Literary Conference.

Our primary aim was to collect all things relating to the language, literature, faiths and history of Bengal in particular, and of Eastern India in general, because in several periods of our past history Behar, Bengal, Orissa and Assam were politically connected, and this our city was the metropolis of royal dynasties which ruled eastwards as far as the head of the Bay of Bengal. Hence there are present several things of special interest to the student of the history of Bihar and even of Upper India. We know that severe scholars will not forgive us for admitting into our exhibition many things which have no connection with our subject proper; but we have deemed it advisable not to leave out any object, yielding curious

interest, historic light or scientific instruction that we have come across in the course of our search.

The exhibits fall into six classes :—

First, old Sanskrit, Hindi and Bengalee manuscripts ; among these, works on Tantra form a rich and diversified collection.

Secondly, Persian and Arabic Manuscripts—several relating to the history of India especially during the decline of the Mughal empire, after the death of Aurangzib. We have collected some histories of this kind that were unknown to Sir Henry Elliot, the author of the monumental eight volumes of Muhamadan India, and are not to be found even in the Khuda Bakhsh collection. During the 18th century, Mughal service brought to Patna many Hindu and Muslim families of distinction from Delhi and the Punjab, and their descendants still preserve their Manuscripts and pictures as heir-looms. As illustrations I have only to refer to the ancient families of Rajah Khayali Ram (now represented by Rai Radha Krishna, Rai Bahadur), Rajah Piyare Lal Bahadur (now represented by Kumar Jagadish Bahadur), Diwan Jai Gopal Ji (by Rai Puran Chand), Babu Ballavi Kanta Ghosh (now represented by Babus Jnanendra Mohan Ghosh and Lalit Mohan Ghosh), Pandit Balgovind Malavi, the lineal descendant of the ancient Hindu astronomer Varahamihir, and to the Gosvami family of Gaighat.

Thirdly, pictures of the Moghal, Rajput and

modern Patna Schools of Indian Art, and Budhistic paintings on silk.

Fourthly, coins, sanads, and a few inscriptions.

Fifthly, stone sculpture, mainly Budhistic.

Sixthly, miscellaneous, including pre-historic celts and copper implements from Chota Nagpur kindly lent by your Honour, a few antique arms and armour, and some wooden sacrificial utensils.

To the various owners of these exhibits, we offer our hearty thanks for their enlightened and liberal aid and loan of their precious possessions. From the point of view of the Bengalee language the loan of the Manuscripts of the Calcutta Sahitya Parishat and of M. M. Hara Prasad Shastri are of primary importance, and these owners have laid us under a heavy load of gratitude for their ready assistance.

I now humbly invite Your Honour to open the Exhibition, and begin the work by exhibiting two curios which require sunlight for their effect, viz, a Japanese mirror and a luminous outline image of Buddha."

পূর্ণেন্দু বাবুর বক্তৃতার অবসানান্তে মহামান্যবর লাট মহোদয় নিম্নে-মুদ্রিত উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতান্তে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন ও তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুক্ষণ প্রদর্শিত দ্রব্যাদি মনোনিবেশহকারে দর্শন করিয়া সমবেত জনবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রদর্শনীগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

"When I was invited to open this Exhibition which has been organized in connection with the tenth Bengali Literary Conference, I accepted the invitation

with much pleasure for two reasons. First, because, if I may use the expression, Bengali was my first love amongst the vernaculars. When I passed the examination for the Indian Civil Service I elected to serve in the Lower Provinces, and Bengali was the principal language which I had to learn. The second reason is that I hope the Exhibition will serve to stimulate the growing interest which Indians are now taking in their past history and ancient civilization.

For many years research in these subjects was carried on almost entirely by Europeans, but during the last decade I have been gratified to observe how rapidly local societies are springing up all over the country which have for their object the prosecution of enquiries into the conditions which prevailed in bygone times. Several such societies have been established in different parts of Bengal, as well as in the Punjab, the United Provinces and various Native States including Hyderabad and Mysore. In our own province the Bihar and Orissa Research Society, which was started two years ago, is doing very useful work. The number of active members is still small, but I can think of nothing better calculated to arouse their activities than this collection of exhibits which has been obtained by the efforts of Professors Jadu Nath Sarkar and Jogindra Nath Samaddar. The number of exhibits, it is true, is not very large, but they are of a very interesting character and are fairly representative of the different directions in which information

regarding the past history of the country can best be gleaned. The collection of manuscripts is particularly interesting and I trust that the number which has been got together at such a short notice is a good augury for the success of the Bihar and Orissa Research Society in the endeavours which it is now making to discover and catalogue ancient manuscripts throughout the province.

You will no doubt be interested also in the collection of stone celts which has been made in Chota Nagpur by Babu Sarat Chandra Ray, the energetic Secretary of the Bihar and Orissa Research Society, and also in the copper implements found in different parts of the same division, of which a few representative specimens have been lent for the purpose of your exhibition. It is not to be expected that such ancient relics should be found in the alluvial soil of the Gangetic valley, but it is interesting to know that in the hilly portions of the province there are numerous remains both of the stone and copper age.

Now, gentlemen, I have much pleasure in declaring this Exibition open, and I wish you all success in your Conference which begins tomorrow."

শ্রীযুক্ত লাট মহোদয়ের প্রস্থানের পরে সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত দ্রব্যাদি দর্শন করিলেন। সম্মিলনের কয়েক দিবসই প্রদর্শনী খোলা ছিল এবং পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ মহাশয় কয় দিবসই প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া প্রদর্শনের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্মিলনের

প্রথম দিবসের কার্য্য শেষ হইলে মূল সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে. টী. সি. এস. আই এবং মাননীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে. সি. আই. ই মহোদয়দ্বয় স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত মোটরে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে গমন ও তত্রস্থ দ্রব্যাদি দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশে উদ্যোক্তৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সম্মিলনের প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গও প্রদর্শিত দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

"স্বাগত" "স্বাগত" রবে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী আপনাদের অভ্যর্থনা করিতেছে। আজ তাহারা আত্মহারা! কি বলিয়া আপনাদিগকে অভিনন্দন করিবে তাহা জানে না। তাহাদের ভাবময় হৃদয়ে বিধির কৃত্রিম বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র স্মরণ আছে —"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা"। চন্দ্রগুপ্তের এই রাজনৈতিক ভূমি, অশোকের বিশ্বব্যাপী প্রেমময় ভূমি, গুপ্ত ও পাল রাজাদিগের শিল্প ও সাহিত্য-সেবিত ধর্ম্মভূমি, প্রাচীন ভারতের মধ্যাহ্ন ভূমি, এই ঐতিহ্য চুম্বিত পূত "ভূমিতে," তৃণানি বিস্তীর্ণ করিয়া আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি। এখানে বিশাল বাহিনী ভাগীরথী এক হস্তে সুবর্ণভদ্রের সুবর্ণময় জল মাখিয়া আপনাকে সুবর্ণাঙ্কিত করিতেছেন এবং অন্যহস্তে গণ্ডকের বিষ্ণুশিলাবাহিনী পবিত্র ধারা নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূত নিজ অঙ্গের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। সেই চতুর্বর্গ ফলপ্রদ গঙ্গাজল আমাদের "উদক"—বাকি থাকে সত্য ও মিষ্ট কথা। এই খানেই আমাদের হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু করে। সুদূর প্রবাস হইতে শুনিতে পাই নাকি বঙ্গের কোন কোন স্থানে সত্য লইয়া দলাদলির সূচনা হইতেছে—নিশ্চয়ই আমরা ভুল শুনিয়াছি। সত্যের প্রকৃত অঙ্গ কেহ দেখিয়াছেন কিনা জানি না। তবে চিরকাল জগতে বাদ প্রতিবাদ দ্বারা সত্যের অবয়ব মার্জ্জিত হয় এবং সেই মার্জ্জনা দ্বারাই আমরা অনুমান করি হয় ত সত্যের কোন অঙ্গ এইবার আমরা যথার্থ ভাবে জানিতে পারিয়াছি। বাদ প্রতিবাদ সকলেরই প্রার্থনীয়। খণ্ডন মণ্ডন ত

ভারতের চির অধিকার। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার সহিত অথচ অতি সম্মানের সহিত ভারতের প্রাচীন মনস্বিগণ এই অধিকার রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের অনন্ত দর্শনের ঘর্ষণে কখনও ব্যক্তির আক্রমণ নাই, যুক্তির আক্রমণ আছে।

আপনারা সকলেই সত্যের সেবক, সত্যভামার উপাসক। তবে আমরা আপনাদের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া যে সত্য কথা বলিব তাহা অপ্রিয় হইলেও নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। সে সত্যকথা এই যে, আমাদের এই প্রবাসে শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার রত্ন ভাণ্ডার নাই, ভীমনাগের রসগোল্লা নাই, বর্দ্ধমানের খাজা নাই বা যশোহরের সুবিশাল মানও নাই। তবে এই সত্যকথাটী মিষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেই আমরা প্রাচীন নীতির অনুসরণ করিতে পারিব। তাই ভারতী মাতার মধুর বীণা-ঝঙ্কার ধ্যান করিতে করিতে কম্পিত হৃদয়ে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমরা দরিদ্র, আমাদের অভ্যর্থনা আপনাদের উপযুক্ত নয়, তবে তণ্ডুলকণা আবেগ পূর্ণ হৃদয়ের কাকুতি মিনতিতে পরিপূর্ণ।

বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তা ভগবতী ভারতীর বীণা সপ্তস্বরা। মাতার ভক্তগণ কেহ কোন সুর, কেহ কোন স্বর লইয়া উন্মত্ত। সকল স্বরের ঐকতানিক মিলনই সাহিত্য। আপনারা মাতার মন্দিরে সকলেই উপহার লইয়া আসিয়াছেন। কেহ সাহিত্যের ঘরে, কেহ দর্শনের ঘরে, কেহ বিজ্ঞানের ঘরে সেই উপহারগুলি সমর্পণ করিবেন। একবার আপনারা ভাবিয়াছেন কি—সেই উপহারগুলি জাতীয় জীবনস্রোতের নিদর্শনী? সেই নিদর্শনী যাহাতে সম্পূর্ণ হয় সম্মিলনের তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

কেবল মাত্র প্রেরিত প্রবন্ধের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কি সম্মিলন সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন? সম্বৎসরপ্রসূত সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের

লক্ষ্য হওয়া উচিত। সম্মিলনের একটি স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি থাকিলে এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইতে পারে। তাহা হইলে সকল গ্রন্থকার এবং সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক তাঁহাদের স্ব স্ব রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা তিন তিন খণ্ড করিয়া ঐ সমিতির সম্পাদককে প্রেরণ করিতে পারেন। সমিতির সম্পাদক তাহা হইলে আগামী সাহিত্য সম্মিলনের সাধারণ সভাপতিকে একবৎসরের সাহিত্য গ্রন্থ এবং প্রত্যেক শাখা সভাপতিকে শাখার বিষয় সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তক পাঠাইয়া দিতে পারেন। প্রেরিত প্রবন্ধগুলিও সম্মিলনের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সভাপতিগণের হস্তগত হওয়া উচিত। যাঁহারা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ বিশেষের উল্লেখ করিতে পারেন। এরূপ করিলে তাঁহাদেরও অনেক সময়ে পরিশ্রমের লাঘব হয়। এরূপ প্রণালীতে সম্মিলনের ধারাবাহী কার্য্য চির উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে পারে। আমরা জানিতে চাহি যে, আমাদের চিন্তাস্রোত কোন্ ধারায় কিরূপ ভাবে চলিতেছে এবং কোথায় তাহার সম্পূর্ণতা এবং কোথায় তাহার অসম্পূর্ণতা। সাহিত্যের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টতা না হইলে জাতীয় ভাবের ও জাতীয় জীবনের পূর্ণ ও পরিপুষ্ট স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না। এই জন্য মনে করি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উপর একটি গুরুভার অর্পিত আছে। সম্মিলন প্রতিবৎসর পক্ষপাত শূন্য হইয়া প্রতিবৎসরের সাহিত্যিক কার্য্য সমালোচনা করিলে এবং যথাসম্ভব গুণ ও কর্ম্মের আদর করিয়া গুণী ও কর্ম্মীকে উৎসাহিত করিলে সেই ভার কতক পরিমাণে বহন করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করিবার জন্য সম্মিলনের প্রতি শাখায় হয় ত একটী স্থায়ী কমিটি হওয়া আবশ্যক। সভাপতিগণ

প্রতিবৎসর এই সকল কমিটির মুখপাত হইবেন। তাঁহাদের সকলের সমবেত উদ্যোগে প্রতিবৎসর একটি সম্পূর্ণ সাহিত্য-পঞ্জী প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। যাহাতে এই কার্য্যে আমরা কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইতে পারি এবং যাহাতে সম্মিলন এই কার্য্য নিজের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, সেইজন্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহোদয়গণের সাহায্যে অভ্যার্থনা সমিতি সম্মিলনের প্রত্যেক সভ্যকে একখানি তাঁহাদের রচিত সাহিত্য-পঞ্জী উপহার দিতে সাহস করিয়াছেন। ভুল ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও উক্ত মহোদয়গণ এই পঞ্জী সঙ্কলনে নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা অভ্যার্থনা সমিতিকে অত্যন্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুণের সমাদর করা চাই। সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষক বড় বড় রাজা মহারাজা আছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রণী হইয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপন করুন যাহাতে সম্মিলন প্রতিবৎসর বিশিষ্ট লেখকগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন এবং মুদ্রাঙ্কনে অশক্ত উপযুক্ত লেখকগণের লেখা সম্বন্ধে মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। অনেক পুস্তক এমন আছে, যে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা তাহার মুদ্রাঙ্কন আশা করা অনুচিত। অথচ সে সকল পুস্তক বঙ্গ ভাষার গৌরব এবং বঙ্গীয় পুস্তকালয়ের অবশ্য রক্ষণীয় সামগ্রী। সম্মিলনের কি কর্ত্তব্য নহে যে এইপ্রকার পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করেন? উদাহরণ স্বরূপ আমি তিনটি পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত "বিশ্বকোষ," শ্রীযুক্ত অধ্যাপক দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় প্রণীত "সমসাময়িক ভারত"। হয় ত কোন কোন স্থলে, সম্মিলন ব্যয়

নির্ব্বাহের জন্য গ্রন্থকারের নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয়ের জন্য লইতে পারেন।

চিরকাল ভারতে ধন বিদ্যার আদর করিয়া আসিয়াছে এবং বিদ্যা ধনের সম্মান করিয়া আসিয়াছে। এই পরস্পর ভাবনাই প্রাচীন ভারতের উন্নতির মূল। এই পরস্পর ভাবনার মূলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, মিষ্টবাক্য ও বিনয়।

আমাদের কি তাহা আছে? আমরা কি আমাদের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিককে যথোচিত আদর করিতে শিখিয়াছি? আমরা কি সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যপোষক ধনীদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করি? আমার মনে হয় যেন আমরা নিজের শির উচ্চ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে বঙ্গের শির অবনত করি। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে যদি অযথা কথা বলিয়া থাকি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমার করপুটে নিবেদন এই যে, এই দশম সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা সকলে যথার্থভাবে সম্মিলিত হইয়া একমনে একপ্রাণে ভারতী মাতার চরণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গের ভবিষ্যতের জন্য, বঙ্গ সাহিত্যের চির উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি ও একটি সাহিত্য ভাণ্ডার স্থাপিত করুন এবং প্রতি বৎসরের সভাপতিগণ কার্য্যকরীসমিতির নিয়ন্তা হউন। হয় ত সম্বৎসরব্যাপী ধারাবাহিক কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত করিবার জন্য সম্মিলনের একটি নির্দ্দিষ্ট, নিজস্ব কার্য্যালয় হওয়া চাই। আমি কোন নূতন কার্য্যকরী সমিতি সংগঠিত করিতে বলি না। পরিচালন সমিতি যাহাতে স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতিতে পরিণত হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। হয় ত পরিচালন সমিতির পুনর্গঠন আবশ্যক।

এই বিস্তীর্ণ মনুষ্য সমাজে সকল জাতির একটি স্বধর্ম্ম আছে। সেই স্বধর্ম্মের এক স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র ভাব। বাঙ্গালী জাতিরও এক স্বতন্ত্র

ভাষা ও স্বতন্ত্র ভাব আছে। আমরা কিন্তু সময়ে সময়ে সেই ভাষা ও সেই ভাবকে এক পার্শ্বে রাখিয়া, পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্যভাব লইয়া দৌড়িতে থাকি। সেই পাশ্চাত্যভাবে প্রবাহিত হইয়াও অনেক সহৃদয় বাঙ্গালী স্বদেশী ও স্বগতভাবে বঙ্গের সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্য ও সমালোচনা যদি সেই ভাব হইতে একেবারে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ভাবের হীনতা হইবে। আমরা যদিও এখন চিন্তার সন্ধিস্থলে অবস্থান করিতেছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব যদিও যুগপৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের বঙ্গে, বঙ্গবাসীর ভক্তিসিক্ত কোমল অন্তঃকরণ এই দুই ভাবকে সামঞ্জস্য করিয়া প্রতিদিন আত্মগত করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং এই চেষ্টার ফলে নিত্য নূতন কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া নব নব সৌরভে বঙ্গভূমিকে আমোদিত করিতেছে। হয় ত জগতের মধ্যে বাঙ্গলার নূতন অধিকার জন্মিতেছে

সেই অধিকারের আপনারা প্রধান অধিকারী। আপনাদের আগমনে আমরা কৃতার্থ। আপনারা সকলে আমাদের বিনয়পূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বঙ্গের উজ্জ্বলরবি ডাক্তার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়কে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব তাহা জানি না। তিনি অনেক কার্য্যে ব্রতী হইয়াও আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাদিগকে ও সম্মিলনকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শশধর রায় —সকল শাখার সভাপতিগণকে আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা উদ্গ্রীব হইয়া তাঁহাদের অভিভাষণের অপেক্ষা করিতেছি।

সরস্বতী প্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যিকগণ! আসুন! এই প্রাচীন মগধ-রাজ্য-এই ভারতের চিরসাধের পাটলিপুত্র আপনাদের চরণরেণুতে পবিত্র

হউক্। মগধের প্রতি ভূমিতে, প্রতি প্রস্তরখণ্ডে, কত গুপ্তকথা নিহিত আছে, মগধের আকাশপটে কত লোমহর্ষণ, কত বিশ্ববিকম্পন, কত মর্ম্মসংবেদন ভাবের প্রতিধ্বনি হইতেছে, আজ আপনাদিগকে দেখিয়া কল্পনারাজ্যে সেই প্রাচীন স্মৃতি জাগরিত হইতেছে। সাহাবাদ জেলার জঙ্গল প্রদেশে এখনও আরণ্য অশ্ব বিচরণ করিতেছে—হয় ত তাহাদের বৈদিকনাম কীকট এবং তাহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বৈদিককালের নিদর্শনীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। বকচর অঞ্চলে এখনও বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম স্থান যেন দেবরাত শুনঃশেফর কাতরোক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মহাভারতের গিরিব্রজ এখনও উচ্চশিরে ভীম ও জরাসন্ধের দ্বন্দযুদ্ধকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। রাজগৃহ এখনও বুদ্ধদেবের পবিত্র গাথা সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ এখনও গৌতম বুদ্ধের সম্বোধি-লাভ ঘোষণা করিতেছে। এখনও যেন আমরা কল্পনার চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি যে জটিল মহাকশ্যপ নিরঞ্জনার নীরে যজ্ঞের সামগ্রীসকল চিরকালের তরে ভাসাইয়া দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে কুসুমপুর নিজ মস্তক উত্তোলিত করিতে লাগিল। কৌটিল্যের-নীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এক মহারাজ্যের বীজরোপণ করিতে লাগিল। পাটলিপুত্রের কাষ্ঠপ্রাচীর ও কাষ্ঠস্তম্ভ, কুমড়াহাড়ের ও বুলন্দবাগের ধ্বংশাবশেষ এখনও আপনাদিগকে চন্দ্রগুপ্তের দারুময় শহরের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু তাঁহার নগর শাসন প্রণালীর বিচিত্র ব্যবস্থার কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

ব্রাহ্মণ সহায় হিন্দুরাজা যে গ্রীকরমণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন এ কথা এখন হয়ত আপনাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে আবার বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীয়মান হইল। জগতের বৌদ্ধ শ্রমণগণ মহাসভায় একত্র হইলেন। মহারাজা অশোক এই স্থান হইতে

তাঁহার ঘোষণা সকল প্রস্তরে খোদিত করিয়া জগতে বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেরিত ভিক্ষুগণ অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র সরল ও হৃদয়গ্রাহী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিল। জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ এক অপূর্ব্ব অধিকার লাভ করিল। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদূর দেশ হইতে বিদ্যা-ভিক্ষুক ও ধর্ম্ম ভিক্ষুকগণ বিদ্যা ও ধর্ম্মে পারদর্শিতালাভ করিবার জন্য উপনীত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয় মস্তক উচ্চে উত্তোলন করিতে লাগিল। মহারাজ পুষ্পমিত্র এই নগরে দুঃসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে যজুর্ব্বেদোক্ত মর্ম্মস্পর্শী ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। উমাস্বতীর "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র". পতঞ্জলির "মহাভাষ্য", কোহলের "নাট্যশাস্ত্র", বাৎসায়নের "কামশাস্ত্র" এই স্থানেই রচিত হইয়াছিল। গুপ্ত ও পালরাজদিগের মহিমাসূর্য্য এই স্থান হইতেই উজ্জ্বলরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিল। স্থপতিবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, সকলরূপ কলা ও শিল্পবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য—সকল বিদ্যাই এই পাটলিপুত্রকেই আশ্রয় করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পাওয়াপুরীর পবিত্র সরোবর ও মন্দির দেখিতে পাইবেন। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর-স্বামী এই স্থানেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অদূরে এই নগর মধ্যে রণজিৎসিংহ নির্ম্মিত হরমন্দির আছে যেখানে দশম বাদশাহ গুরুগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যলীলার কিংবদন্তী এখনও খাল্সা সিংহগণ গৌরবের সহিত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিহার নগরে প্রসিদ্ধ সুফিলেখক মকদুম্ সাহেবের সমাধি, মুসলমান ও হিন্দু সকলেরই আরাধ্য হইয়া আছে। সাহআর্জান্, পীরবহোর প্রভৃতি বাদশাহ কর্ত্তৃক সম্মানিত মুসলমান সিদ্ধ-পুরুষগণের সমাধিসকল এই নগরকে অলঙ্কৃত করিতেছে। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ও ইস্লাম্ সকলেরই ধর্ম্মধ্বজা এককালে উড্ডীয়মান হইয়া

মগধের উদারতা ও বিশ্বব্যাপী প্রেম এখনও জগৎকে জানাইতেছে। বাঙ্গালীর সহিত মগধের সম্বন্ধ এক অতীতের কাহিনী। বঙ্গের অর্থবীর শাস্ত্রবীরগণের আলোকে মগধরাজ্য উজ্জলিত হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শীলভদ্রের যশ প্রাচ্য মধ্যে সুবিস্তীর্ণ হইয়াছিল; প্রতিভাশালী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশিলাকেও প্রভাবিত করিয়াছিলেন, জৈন স্থূলভদ্রের যশ এখনও কীর্ত্তিত হইতেছে। এই স্থানে রাজা রামমোহন রায় আরবী ভাষায় কোরাণ শিক্ষা করিয়া সম্ভবতঃ পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেদিনেও নিধু বাবু ছাপরা হইতে তাঁহার মধুর টপ্পা দ্বারা বঙ্গভূমিকে আমোদিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মগধ রাজ্যেই দীনবন্ধু মিত্রের "কমলে কামিনীর" সূতিকাগার। নবীন সেনের "রৈবতক" ও "কুরুক্ষেত্রে"র অনেক কল্পনা বিহারের কানন হইতে উদ্ভূত হয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" বিহারেই লিখিত হয়। আর আমাদের বলদেব পালিত এই স্থানেই বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের অবতারণা করেন। তাঁহার "কর্ণার্জ্জুন" কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত ভারতের এই বিচিত্র রঙ্গভূমিতে ভারতীর বরপুত্রদিগকে অভিবাদন করি। আপনাদের সকলের চরণসেবা করিয়া যেন আমরা সকলে কৃতার্থ ও ধন্য হই।

এক্ষণে আপনারা আমাদের সকল ত্রুটী, সকল অক্ষমতা মার্জ্জনা করিয়া সভাপতি বরণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন।

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি সি. এস. আই

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

সভাপতি

মান্যবর বিচারপতি

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি,

সি. এস্. আই. মহাশয়ের অভিভাষণ

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

"সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা যা'র মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর, মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন সন্তান।
অমর-ধরণী' পরে অমরসমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া মাতৃভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা-রোগজর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন আপন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া

উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী-হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আরব্ধ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে অনেকে বলেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে! এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা-ভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?"—ইত্যাদি! যাহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশশতবৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায় উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালীজাতির যদি জগতে

কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব, একা আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারিবে, নিজেকে ধন্য কৃতার্থম্মন্য মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে, এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতিপ্রণয়নের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ সেই মহা মহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যেস্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ-সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলিপুত্রের পুরাচিহ্ন সমূহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্‌গ্রীব, ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতিপত্রে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলিপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন,—বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্য-জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং

বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথিগণের স্পৃহণীয় আসনে আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্হ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে, বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে, আমি সভাপতিরূপে কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি, ইহা আমি যতটা জানি এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজে, কোন উপকারে, আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, চরিতার্থ হই। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্যসাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্য-সাধন যজ্ঞের ঋত্বিক্‌রূপে মনোনীত করায় উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে, এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে, যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল, যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা

আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন, আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের, যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্যদেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গলাভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন্ না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয়, যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। একদিকে, দেশের যাহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত সেই শিক্ষার্থি যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন, আর দু'দিন পরে, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তর্জ্জনীহেলনে দেশের কোন মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদল-বাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে; আর ঐ দেখ, অন্যদিকে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা

বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্র-ক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে আমি জাতীয়-সাহিত্য-গঠন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "দেশের জন-সঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজ দেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্ব সাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই সে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।" সুতরাং জাতীয় সাহিত্যগঠন সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিতে হইবে। তবেইত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ

করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়, আবিষ্কার এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ, এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই যাহাতে বঙ্গভাষাও অপরাপর ভাষার ন্যায় শিখিতে হয়, না শিখিলে, অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্য শত ভাষার শিক্ষাতেও পূরা মানুষ হওয়া যায় না, যদি এমনই ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, আমার জননী বঙ্গভাষাকে অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে। বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাক্। একদেশের ভাষা অন্য

দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটী, একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য।

রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতা-লাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংরাজরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজীভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ-বাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজিভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাসিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয়-বৈজয়ন্তী, সংস্কৃতভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীকভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান্? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কোন্ আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না। মনে করুন, গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র, রাসিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের

এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্রব্যবসায়ী-দের পক্ষে সেগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়ন শাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান, ঐ ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান, তবে তাঁহাকে রুসীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়রের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাসিয়ান্ এবং ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, তৎ তৎ ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন বিষয়ে রাসিয়ান্ ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্ষপীয়র, মিলটন, বাইরণ প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজি ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুসিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশ সমূহেও এই এই ভাষার কি এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন, পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে, কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখ, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের

অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া, সকল দেশের জ্ঞান পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস, শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষ উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই; ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায়, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এদেশীয় শকুন্তলা নাটকের বিদেশীয় কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন। জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতির মনীষাসাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক্ ভাষা এই মবধামে অমরত্বলাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও সম্পদের আধিপত্যে ঐ ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর জ্ঞানের আধিপত্য অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলা-ভূমিতে ঐ যে সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তা রত্নবিমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক, স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জগতের ঐহিকবাদিগণের পরস্পর বাদ বিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে,—ঐ সকল মনীষামন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না। নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও, সেই প্রাচীনকাল হইতে বেদাদি রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত ভারতী একইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের সযত্নগ্রথিত মণিময়হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই

অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীট রূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল, সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি, তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তর কালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্বস্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপি-বদ্ধ করিয়া যান,—এবং এইপ্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাবীণ্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্বস্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাসিয়ান্, গ্রীক্, লাটিন্, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবত্ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দুদশ-বৎসরে সম্ভব নহে বা আরম্ভ মাত্রেই ফললাভের আশা নাই, কিন্তু যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ-কমনীয়, নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্বস্ব উপার্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যসম্ভার, নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য, ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গ-ভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর বিজয়প্রশস্তি ঘোষণা করিবে। এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে সৰ্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞবেদিতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্যমায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক, কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয়ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম যাহা কিছু সৎ উদার অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গ-

ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গলার সম্পত্তি বাঙ্গলার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। উষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে, ভাস্বর হইবে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই, বাঙ্গালার মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, ক্বচিত্ নদীমাতৃক, আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়। চিরকাল হইয়া আসিতেছেও। কোথাও বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুফল লাভ সর্ব্বত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রামপ্রসাদ, কৃষ্ণনগরের ভারতচন্দ্র, খানাকুলের রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্লী বাটের সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীল-দর্পণের দীনবন্ধু, কপোতাক্ষীর মধুসূদন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উত্সর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও যেদেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই

একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। মেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবসু নিধুবাবুর বঙ্গে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না। প্রাণের, অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এইত, সামান্য উদ্যোগেই ভীরু বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতে-ছিলাম, আছে সব, মালমসলা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জন কয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতি-বিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন, কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি, আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য, কঠোর বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষের

স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হইবে, তাই, আপাততঃ ঈষদ্ অপ্রিয় হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধি ভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়তাভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সম্যক্‌ভাবে পৌঁছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর, এরূপ অপরিপক্ক বয়সে, তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে, অচিরাৎ সমস্ত উত্তম উদ্‌যোগ পণ্ড, ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চির তুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাহারা পৌঁছিতে চাহে, উপত্যকাব কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি জন্মিলে চলিবে কেন? মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না। আমার ভাবিতেও দুঃখ হয়, যে, এই সবে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সানুরাগ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, আর ইহারই মধ্যে, দলাদলির সৃষ্টি। আমি সানুনয়ে বলি, সনির্ব্বন্ধে বলি, আমরা সকলেই এক মার সন্তান, বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী, মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহুকোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত

পরিশ্রম করিলে তবে ঐ সংকল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তি প্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দিরগঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন। মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব নিকাস করিব না, এখন হিসাব নিকাসের সময়ও নহে, করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব, কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে, কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মাভিমানের চরিতার্থতা বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোনপ্রকার অসংযমের আধিক্য হইলেই, এই সঙ্কল্পিত স্বর্ণ-সৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গ-সাহিত্যের হিতৈষিবৃন্দ, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতিবৃন্দ,—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিরোধ বিস্মৃত হইয়া, একই লক্ষ্যে চিত্তস্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন, সমস্ত ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের পুটুলিগুলি দূরে এককোণে সরাইয়া রাখিয়া, একমনে একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবাল-

বৃদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনি নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন "বান" আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে, সত্য, কিন্তু সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে, সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম সৎ, যাহা নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদিতর কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল উপকথা রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃষসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল গল্প, সেই "সাতভাই চম্পা",—সেই "পক্ষিরাজ ঘোটক", সেই "শিবঠাকুরের বিয়ে", প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়নরঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায় যে কৃত্তিবাস কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্বার উপলব্ধি না করে ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারেনা। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জ্জন এবং কতটুকুই বা বর্জ্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার

হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গ-সন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতীয় হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া, হাল ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সেপক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে। যে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত, তখন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ শোভা পায়? যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে। অঙ্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া লাভ কি? আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই, এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টা-পর হইতে হইবে। এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না, যে যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন্

আলেখ্যের পশ্চাদ্ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে, যেমন মূলচিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান, স্ব স্ব জ্ঞানগরিমায় যতই বিমণ্ডিত হন্ না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটি কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন, বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ, এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যত দিন না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অগ্নিতে অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জ্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য —আত্মবিকাশ লাভ করা। হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। এই ভাবে যদি মানুষ একবার তৈরি হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন্ ছার। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে

চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে,—ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে না পারি, যে, আমি কি চাই, কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি এক বার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই দিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই, যে সে গতিরোধ করিতে পারে। বাঙ্গালা জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোন ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয়জাতীয় অভ্যুদয় গ্রথিত, বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতরভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে একভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী-মূর্ত্তির বিমলপ্রভায় বাঙ্গালী জন-সাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। "বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গলায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামল কাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্যনীল-নবীন নভশ্চন্দ্রতপতলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুককোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শগ্রন্থ, সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতী লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী, রাম যুধিষ্ঠির শিবি দধীচি, ভীষ্ম অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক, ভরত লক্ষ্মণ ভীম অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা, তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও, ঐ দেখ,—তোমাদের জন্য যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে, তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্রপুষ্প-পল্লবে, বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহার-বিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণ সদ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া, তোমাদের সাহিত্যমণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে "মা" বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর

সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদ বিসংবাদ স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রতদীক্ষিতের মত, সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদ-পূজায় প্রবৃত্ত হও, একবার মাতৃ-প্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া, সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে "মা" বলিয়া ডাক দাও, বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাইবে গান॥"

দেখিবে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া, তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে, বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লগ্নে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীমশক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এতদিনে অন্যপ্রকার হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য, যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালীজাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে

অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ,কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরেণ্য কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ-মিশাইয়া জলদ প্রতিম-স্বনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশ্রয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।'

আর সেই সঙ্গে বলিও—হে বঙ্গের জাতীয়
সাহিত্যমন্দিরের ভবিষ্য স্থপতিবৃন্দ,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ

[illegible] প্রেস, কলিকাতা।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের

অভিভাষণ

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ ধুনা জালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে!

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব

অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন্ কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময় সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতি-কাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশাকরি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারাণ ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, উর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে

ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে; বাঙ্গলা প্রাণে প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্চক্রবালের পরিধিপারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবনে এই

মহামিলনমন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা ;—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাইলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব !"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন ? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

—ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাঙ্গলার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল একপ্রকার মল্লযুদ্ধ বাধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণ-রন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিকৃতির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই, করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা"

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাবদৈন্যের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য টীকাটীপ্পনির সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত নাও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব। আপনারাও যদি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া সেই অভিরাম কবি চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র সন্ধানে আসেন;—ধৈর্য্য ধরুন, সে বাঁশীর রাগিণী আপনাদেরও কান জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য্য ধরিলে মুরারি মিলিবে। সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব"। নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন কথা হইতেছে কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শ এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম;—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের

ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত কাল পক্ষ, দিবস, রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবন্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজবিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিকতত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়মাঝারে যে স্বচ্ছ-দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে

স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জলধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দউদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, ইহাই সমাজবিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশজনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যরূপ আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত সংস্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান প্রদান ভাব অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায় না। না পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন মৃত্যু, ও শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তার পর, দিন গেল. নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপতৃষা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পনার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে! আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে!

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষাস্বভাব সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্তি, রূপেরভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটী ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলায় রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই লীলামৃত রসাধার। এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র

রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারি লীলা। এ বিশ্বসৃষ্টি তাঁহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস!

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধির নীতি ও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealist ও নয়, Realist ও নয়, সে Naturalist, শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদ্ও তেমনি ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট্ শিল্প, মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে; আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময়

সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণ যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকার নিশীথিনীর বিদ্যু-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই—যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রসসাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটীক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্য দ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাসলীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্য ও সত্য ত্যাগের বিরাট্ ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্ত্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত

করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন। তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা
কহে চণ্ডিদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা।"

এই বিশ্বসৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানবপ্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলন-ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল, সহজ সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতল-স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা

কথা আছে যে, "ছেঁদো কথায় ভুল না", তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন! কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরণা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অনীয়ান্, মহৎ

হইতেও মহীয়ান্; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙের খেলা। এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নাম রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই অনন্তের দিক্ হইতে দেখিলেই রূপান্তরে পৌছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শগন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য্যলীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার

নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাহার এক বিরাট্ হৃদয়। সেই বিরাট্ হৃৎপিণ্ড এই বিরাট্ প্রাণসমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকাল ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যের গীতি-কবিতার ধারায় প্রথম যে ভাষায় আমরা আজকাল গান ও কবিতা পাই, তাহাকে নাকি সন্ধ্যাভাষা বলে। সুপ্তি ও জাগরণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো ও দো-আলোর খেলা। এই সন্ধ্যাভাষায় সহজিয়া ধর্ম্মের সকল গানই রচনা, আর তাহাই নাকি বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রাচীন সম্পদ্। তাহাতে যে সমস্ত পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ও রহস্য এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। তবে সহজিয়ার মধ্যে স্ফূর্ত্তির উপর জীবনকে গাঁথিয়া তুলিয়া আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সে যত সন্ধ্যারই আলো-আঁধারি রউক না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, সেই গৌড়ীয় যুগে চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলি-গান অতুলনীয়। আমার মনে হয়, সে ওই সন্ধ্যা ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডিদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে। অনেকে ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডিদাস ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই পারে না। তবে এ সমস্ত মতামত লইয়া আলোচনা করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। আমি শুধু ভাবের দরজার দ্বারী, সেই মন্দিরের পূজার কিঙ্কর, আমি তাহার কথা কহিব এবং

চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গলা কবিতার প্রাণের সহজ সরল ভাবগুলি মিনিস্থতার মালার মত গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-কবিতা রসভরা পাকা ফলের মত, তাহার খোসা আছে, শাঁস আছে, রসে অনুপম মিষ্টতা আছে, এমন কবিতা বাঙ্গলা দেশের গৌড়ীয় যুগের চণ্ডিদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্য্যন্ত মিলে না। চণ্ডিদাসের অনুভূতি আর কাহার হয় নাই। একদিকে বাঙ্গলার পর্ণকুটীরের কবি চণ্ডিদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শিবসিংহ ছিল, লছিমা ছিল, চণ্ডিদাসের ছিল—

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি"

আর ছিল রামী! একজন রাজ-অনুগ্রহে সম্মান-সুখভোগের মধ্যে পালিত, আর একজন দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা-পীড়িত। বিদ্যাপতির লছিমা দূরে আকাশের কোলে উজ্জ্বল তারকার মত, আর চণ্ডিদাসের রামী তাঁহার বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর। দুইজনেই জীবনের সকল দিকের কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, দুইজনে কিন্তু সমান পারেন নাই। দুইজনেই কবিতার মিলনমন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন। একজন মন্দির-দ্বারে আসিয়া থমকিয়া থামিয়া গেলেন, আর একজন সেই মণিকোটার প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন,—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

"রসেতে গাঁথিয়া" এও সেই সহজিয়ারই কথা। এই রসের সাধনাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে, সেই রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা, যাহার কাছে—

"মায়া আসি প্রেম মাগে"

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধ হয়, জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ, এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ ; তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"......সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।"

শ্যাম-বিরহে রাধিকা বিবশা, পিরীতি যে সুখের সাগর তাহে দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে, অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি—এই অবধি যুগল প্রেমের লীলায় যে মিলন-বিরহের রস-মাধুর্য্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু এইটুকু হইল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীপুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের মধ্যে যেটুকু তাই, কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হইয়া গেল, মানুষের এই সুখ-দুঃখের ভিতর হইতে চণ্ডিদাস সেই ভাগবত সত্যকে রূপান্তরে টানিয়া তুলিলেন। ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু রসপণ্ডিতের রসশাস্ত্রের আলাপ নয় ; এ যে জীবনের এক চরম অনুভূতির কথা। এই চরম অনুভূতি বিদ্যাপতির হয় নাই। অনুভূতি শুধু আনন্দের ভিতর দিয়া ত' হয় না—সকল রকম বিচিত্রতা না আসিলে জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে ? এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় মন যে রসোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দাঁড়ায়। একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের

ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডিদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে, যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ-রস-গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন; তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপ-রসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ডুবারির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন। বিদ্যাপতি গাইলেন, রাধার বিরহের কথা,—

"আপনহি পেম তরু অর বাঢ়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পলব কুসুমে বেআপল
সৌরভ দশদিস গেলা।
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মূর জঞো মূড়হি সঞো ভাগল
অপদহি গেল সুখাএ
কুলক ধরম পহিলহি অলি অওল
কঞোণে দেব পালটাএ
চোর জননি নিজঞো মনে মনে ঝখঞো
রোঞো বদন ঝপাএ॥
অইসন দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহব বম জানি আগি।
বিদ্যাপতি কত আপনহি আউতি
সিরি সিবসিংহ লাগি॥"

প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা-পল্লব-কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সখি, দুর্জ্জনের

পাইয়া যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া শুখাইয়া গেল। কুলের ধরম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, দেহ গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
গুরু গরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া হাতে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহি যে তোরে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহি যে কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে॥

পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥

রসজ্ঞ সুজন মাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদ ও মিলনের রসে রসিক ও দরদী, তিনি উভয়ের এই দুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, বিদ্যাপতি শুধু মাত্র রসের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস তাহাতে মজিয়া ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দুইটি গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়া যায়, হয় ত উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবেই ইহার স্রষ্টা, অথবা একজন একজনের আগে কিংবা পরে, কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু এখানে ভাবের দিক্ দিয়াই বিচার করিব। বিদ্যাপতির রাধিকা কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কিন্তু দুর্জ্জনের দুর্নীতিতে তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুখাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চণ্ডিদাসের রাধিকা কহিতেছেন,—

'গুরু গরবিত বসতি আমার'

আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সই রে, তোরে আর কি বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরম কথা জানিবে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন, 'কুলের ধর্ম্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে?' চণ্ডিদাসের রাধা বলিতেছে,—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।'

এই জায়গায় উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি"র ব্যঞ্জনা হইতে 'পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে' এই কথা কয়টিতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ওই ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর বিদ্যাপতির রাধার অবস্থা 'গৃহ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল ঢালিয়া দিতেছে' ভিতরে বাহিরে জ্বলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় বিদ্যাপতি কহিলেন, শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। অর্থাৎ তাঁর শিবসিংহের প্রেমে বদ্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন। চণ্ডিদাসের শিবসিংহ ছিল না, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে—

'কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে,'

শুধু এই থানেই তিনি তাঁহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

'পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে, বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥'

এই সমস্তটাকে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিশাইয়া জড়াইয়া দিলেন, কিন্তু চণ্ডিদাস রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের, শুধু রাধার মনের নয়, কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। তার পর নিজে রাধা হইয়া অথচ দূরে দাঁড়াইয়া

তাঁহার রাধার সমস্ত ভাবটিকে বিশ্বের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর রাখিয়া তাহাকে গাঁথিয়া দিলেন। ভারত-শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধারা ভারত-শিল্পে পাওয়া যায়, সে দেবমন্দিরে প্রত্যেক পাষাণখণ্ডের সার্থকতা থাকে ; বিশ্বকে আদর্শ করিয়া যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে সেটি ঠিক তেমনি ভাবে গাঁথিয়া তোলা, এমন কি, সেই মন্দিরের স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও বালুর রাশ জমান থাকে, খণ্ড প্রস্তর যে পূর্ণতা ভাল করে নাই, তাহার স্বাধীন পরিণতি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদর্শন। বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা। কবি চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি যেন প্রকাণ্ড মন্দির। ভারত-শিল্পে স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি সার্ব্বজনীন ও অতুলনীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পরস্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্ব্বরাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবার স্থান এখানে নাই, কেননা, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে, বিশদভাবে না দেখাইলে তাহার ঠিক চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে উভয়ের পদাবলীর রসবিভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের আতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া, তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে "ত্রিভুবনমতি-তন্ময়-বিরহ" বিদ্যাপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দ সুর তাল, অনন্য-সাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথা ভাল করিয়া অনুভূতিতে না আসিলে উপরের কথাই বেশী হইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে। বিদ্যাপতির কাব্যে কতকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলার এই প্রেম-রসের সাধন রাধাকৃষ্ণ-লীলার গানে গৌড়জনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন অবাধ হাওয়া, অজস্র জলধারা, শ্যামল প্রান্তর, অজয়ের ফেনমুখ গৈরিক জলস্রোত। পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গলা দেশ তখন গানে গানে মুখরিত ছিল। সে কাল এখন নাই। সে পদাবলী সাহিত্যের গান-গুলিকে বৈষ্ণব কবিরা, এক এক রসে ভাগ করিয়া সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুল-লতা-পাতার রঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকটি যেন এক একটি খিলান, আর রস যেন সেই খিলানের চাবি, সেই খিলানের পর খিলান গাঁথিয়া এক বিশাল বিরাট্ মন্দির রচনা করিয়াছেন,—যাহাতে মানবের সকল অবস্থার রসলীলাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের যে সকল পদাবলী ভাব-সম্মিলনে বা রাগাত্মিকায় আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও রূপান্তরের যে যে ভাব, স্তর ও ধারা পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যা-পতির একটি সর্ব্বজনবিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে,—

“সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥

কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল !
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহে ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক।"

আমার মনের ধারণা যে, লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ বলেন, তাহার কারণ তাঁহারা চণ্ডিদাসের পদাবলী আলোচনায় যে রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাপতির এই পদের উপর আরোপ করিয়া তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্যাপতির শেষ কথা হইল,—

"লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখব
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল,"

ইহা সেই চির-নূতন ভাবে রসোল্লাসের কথা। জন্ম হইতেই আমি রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়া রাখিয়াছি, তবু সে রূপের সীমা পাইলাম না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বঁধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবু ত এ হৃদয় জুড়াইল না, নয়নের তৃষ্ণা মিটিল না। বিদ্যাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, রূপ রস গন্ধও তাঁহাকে তেমনি আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা শুনা, তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করিয়া হয় নাই, আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে বুকে বুকে করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয়

নাই। তিনি "প্রেয়"র মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে দেখিতে পান নাই ; আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক-মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
* * * *
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥"

সেই কথা শুধু আঁখির তৃপ্তির কথা নয়, না দেখিলে পরাণ যে বাঁচে না। বিদ্যাপতি সুর বদলাইয়া উপরের পর্দ্দায় উঠেন নাই, চণ্ডিদাস সুরের আসল রূপটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ডুবিয়া গেলেন, গাইলেন—

"বধু তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।
* * *
(এক) তিলে শত যুগ দরশন মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥"

এখানে যে সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেছে। এখানে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামের সুর নয়, এ সুর অন্তরের মিলন-মন্দিরের অনাহত ধ্বনি!

তার পর বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'—

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গ চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায়॥"

পাপকর্ম্ম দ্বারা যতেক ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিলে খায়, মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাসা ত করে না, কর্ম্ম সঙ্গে চলিয়া যায়—

অন্যত্র—

'আধ জনম হম্ নিদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস-রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুণ তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমাণ।"

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা নাই। কিন্তু প্রেমে যে মজিয়া ডুবিয়া, রসিয়া মরিয়া, বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তার এ মরণ-ভয় কেন? প্রেম যে অজয় অমর; সে ত মরণের সময় ভয় পাইবে না, তার ত পরিণাম ও পরিণতি নাই। সে যে নিত্য সত্য জীবন্মুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,—

"আদি অনাদি নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তাহারা—"

তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার তোমার ; হে মাধব আমায় তরাও। কিন্তু কি চণ্ডিদাস গাহিলেন,—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা"

যাহারা প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। তাহাদের ত পরিণাম ভয় নাই।

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণামে কভু ন হবে টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥"

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে ত কাম-গন্ধ নাই। এ প্রেমে পরিণামে কভু টুটিবার ভয় নাই। সে যে নূতনকে আরো সৌরভে স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়। চন্দন যেমন ঘষিতে ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি।

"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ"

চণ্ডিদাসের পাপের ভার বোধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া হেম হইয়াছে, তার আবার পাপ কি ; তাহার সেই

প্রেমের মধ্যে "তাহারে পাইবে।" এ বিশ্ব-সংসার তাঁহারি, তাঁহাকে যখন পাইলাম, তখন 'পুত্র পরিজন সংসার আপন' সকলিই ত মিলিল। তার পর চণ্ডিদাসের শেষ অনুভূতি। এখানে চণ্ডিদাস জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, ভয়-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয়গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের রসসিন্ধুর মাঝে ঢেউয়ের মত দুলিতেছেন।

"মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হল বুড়া।
অনিত্য কুলের একি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ
মাটীর জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ
কহে চণ্ডিদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝায়ে কেহ॥"

ইহা চণ্ডিদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল—আছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন একুল ওকুল দুকুলেরও ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ নয়, সময়ও অল্প, এই কয়টা কথা যাহা বলিলাম, ইহাতেই আমি সে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিদ্যাপতির দোষের কথা যাহা বলিলাম, সে শুধু চণ্ডিদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া; কিন্তু বিদ্যাপতি যে খুব বড় কবি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের জীবনে যে অনুভূতি পাওয়া যায় বিদ্যাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না, সে অনুভূতি আর কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সেই আদর্শেই বাঙ্গলা এখন পৌছিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায়, হয় ত আবার সেই বাঁশীর ধ্বনি কর্ণে আসিবে, প্রাণসুন্দরের সে বিমল রূপমাধুরী আবার আমার দেশে ফুটিয়া উঠিবে।

চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কায নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা

আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে
ভিতরে দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এ দেশে কহিল
লাগিবে মরমে ব্যথা।"

যে দেশের কথা চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই? কল্পকলা ও জীবনের আদর্শ তাহা না হইলে বা মিলে কই? তিনি বলিতেছেন, "বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখ্‌বি, আলোর মাঝে সেই কালো।" এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডিদাসের ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়া ছিল, মহাপ্রভুতে তাহা জীবন্ত জাগ্রত জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। দিনমণি-সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডিদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ বাঙ্গলায় জানাইয়া গেলেন, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবার পূর্ণ রূপ আসিতেছে, উঠ উঠ জাগ—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, মনোহর কবিতা চাই না, এ সকলের কিছুই আমি কামনা করি না,

কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

চণ্ডিদাসের গানের যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল! মহাপ্রভু বলিলেন, "অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করি না।"

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান করিলে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ আমি জানি তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল—তাহার কথা বলিব। যদিও তাহাতে গীতি-কবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা চাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন,—

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য-সার॥

প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার॥"

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,—

'রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার'

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন, "প্রভো, শুধু একটী কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটি বলিলেই আমার বলার শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ত-বিনোদন হইবে কি না, তাহাতে যে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "রামরায়, বল বল, সেই রাধা-কৃষ্ণের বিলাসবিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন রায় গাইলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়া বাঁশীর স্বর শুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে ছুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥'
না সো রমণ না হম্ রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥'

এখানে শ্রীমতী বলিতেছেন :—

না সো রমণ না হম্ রমণী
দুঁহু মনোভাব পেশল জানি।

মন এখানে প্রেমরসে ভরপুর। ভেদ-বুদ্ধি রসের অতলে ডুবিয়া গেছে। ইহাই কল্পকলার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস-বিবর্ত্ত, চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব-রাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্ম্মে ধ্যানে ধারণায়, তাহার সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মনে হয়, চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেক যুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গলার মনে লুকাইয়াছিল, যে

'হৃদয় আছিল বেকত হইল
এখন দেখিনু সে',

এমন করিয়া ভাব-রাজ্যের খেলা সৃষ্টিতে সহজ সরলরূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্ত্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা, কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে। চণ্ডিদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গলা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়া-

ছিল, চণ্ডিদাসের গৌড়ীয় যুগে যে সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি আরো বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আরো সার্ব্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে জীবনে ও কর্ম্মে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবতে ভগবান্‌কে শুধু যুগলরস-মূর্ত্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্য দিয়া শুধু মধুরেই মিলায় নাই; তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে রামানুজ ও মাধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পর, আমরা যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্ব্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই সকলে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই রূপান্তরই তাঁহার আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা সেই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন, চণ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শেও পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পদাবলীর ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই তাল।

কবি জ্ঞানদাসের একটি পদকীর্ত্তন তুলিয়া দেখাইব যে, সেই একই ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে,—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
কি আর বলিব সই কি আর বলিব
যে পণ করাছি চিতে সেই সে করিব
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে
লহু লহু কহে কথা পীরিতি মিশালে।
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাব আগুনি।'

সেই একই কথা—

'রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে,

রূপ দেখিয়া হৃদয়ের রূপতৃষা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন করিয়া বলিয়া উঠিব, তাহাকে দেখিয়া তাহার স্পর্শের জন্য গা যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে। এ ত সেই পূর্ব্বরাগ। জ্ঞানদাসের পদের একটু বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মুরলী শিক্ষা—

'মুরলী করাও উপদেশ
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম

*   *   *   *

জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধা বাঁশী রাধার মুখেও 'রাধা' বলিবে, তার উপায় কি? বাঁশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়া আছে, সেও ত রাধা ছাড়া আর কিছু বোল বলিতে পারে না, তারও জীবন যে রাধা। কিন্তু এই সকল কবিতাই চণ্ডিদাসের ছাপ। এ কবিতাগুলির মধ্যে চণ্ডিদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের পর আমরা যে যে কবির পদাবলী পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার রাগিণীই ফুকারিয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গালা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেই ভাব সভ্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও কল্পকলার সেই রূপান্তর। কবি লোচনদাস, চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাঁহারই একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এই—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
(আমায়) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে, (আমি) চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইয়ে কেশ নাহি বাঁধি!

রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূঁয়ার ছলনা করে কাঁদি ॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ ॥"

ইহার ভিতর সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া বাহির হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গলায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই। লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাইয়াছিলেন,—

"আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা ॥
হলুদ বাটীতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরা চাঁদ পড়ি গেল মনে ॥
মনে প্রাণে মেল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে।
ছনছনানি মনে গো সই ছটফটানি প্রাণে ॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা ॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সমবরিতে নারে;
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে ॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥"

বাঙ্গলার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখন কাব্য-রস ফুটে নাই, এ অপূর্ব্ব, অনুপম। গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন।

ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল। একদিকে নিত্যানন্দ আর একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্যদিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্ত্তন আছে; এখনও বাঙ্গলায় তাহা ভিখারী বৈষ্ণবে গাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে কল্পকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই—শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই রূপান্তর লইয়া গিয়াছেন, ইহাঁদের ভিতর অন্যান্য কবিরা আর তেমনটা পারেন নাই। কেহ বা বলিতেছেন,—

'হরি হরি আর কি এমন দশা হব
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব ॥'

ইহা কবি নরোত্তম দাসের পদে আছে। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইবার সাধ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু চণ্ডিদাস প্রভৃতির ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চণ্ডিদাস যা গাইয়াছেন, কবি লোচনদাসও তাহাই গাইয়াছেন,—

"এ দেশেতে কবাট দিলে, সে দেশ তো পাই
'বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই ॥'
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি
মণি হারাইলে তবে না বাঁচয়ে ফণি ॥
যতন করে রতন রাখা বাহির করা নয়
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয় ॥
লোচন বলে ভাবিস কেনে, ঢোক আপনার ঘর
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর ॥"

ইহা অবস্থার কথা, ভাষায় জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝান যায় না। চৈতন্যের যুগে পরবর্ত্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই চণ্ডিদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দ্দায় গাইয়াছিলেন, তাহার পর আর সমগ্র গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর ভিতর এমন কেহ নাই, যাঁহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়া যাইবার কারণ কি? কারণ যে ঠিক কি, তাহা বুঝা কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ফুল শতযুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যাভাবায় আধো আলো আধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব ফোটফোট হইয়াও ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব-মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত যুগ অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডিদাসে দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতর হইয়া প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্ম্মের সহিত রামানুজের যে লীলা ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এখন পূর্ণ ভাবে মুঞ্জরিত হয় নাই। চণ্ডিদাসের প্রেম, বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, লোচনের গৃহ-ধর্ম্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার সূচনা হইবে, সে দিন জগৎ দেখিবে, এই বাঙ্গলার প্রাণ কোথায়, তাহার মর্ম্ম কোথায়! আবার বাঙ্গলার মাটীতে তেমনি আবেগে, তেমনি সোহাগে তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ হইতে রূপান্তরে ফুটিয়া জাগিয়া উঠিবে।

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা

দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দর-দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেব না॥"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি!

বৈষ্ণব কবিদের এই অফুরন্ত গানের সুধার ধারায় সারা বাঙ্গলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব-জুড়ান প্রাণ-মাতান সুধা-স্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুখাইয়া আসিতে লাগিল। সাহিত্যের অন্যান্য ভাগ শাখা-পল্লবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হইল না। যখন মুসলমান বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল, তখন বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি একেবারে হারায় নাই, তখনও সমাজে মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধিয়াছে; সুর উঠিয়া, সুর নামিয়াছে। তাহার পর সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। বাঙ্গলা আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান ধর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা আপনার চারিধারে আচার-ব্যবহারের একটা গণ্ডী টানিয়া দিল—সেই তাহারি মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু সাহিত্যে ভাবে ও ভাষায় মুসলমানের হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদিকে শাক্তের পঞ্চ-মকার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুখনা মালার ঠক্ঠকি, আর চারিদিকে যত শৈবের দল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতেছিল। একদিকে দেশের পতি মুসলমান,

অন্যদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত প্রেত। এতদিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গলা নিজেকে আদর্শের সমান করিয়া আনিয়াছিল, সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গলা চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাইয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামল অঞ্চল উড়িয়াছে, কিন্তু যে মিলনের কথা বলিয়াছি, তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। মুসলমান বাঙ্গলায় আসিবার পর বাঙ্গলা শ্রীহীন হইয়াছিল, একে দেশ দুর্ব্বল, তাহার উপর মানসিংহ বাঙ্গলার রাজা। প্রাণের কবিতা তখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের উপর বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার কবিতা মুসলমানী ফার্সীর আরবির ছবি ও ছায়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার চরিত্র অঙ্কনে নিপুণতা থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চণ্ডিদাস-যুগের বৃন্দা ও বড়ায়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী কেতাবের কুট্‌নী দাসীর কেচ্ছা। সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা নাই, সে সখীর মত সখী নাই; সে সখীর জন্য অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুখাইয়া গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘরসংসার ঘেরিয়া যে কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন,—

"ওরে সকলের মূল ভক্তি তার দাসী
নির্ব্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।"

এও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গলা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডিদাস গাইয়াছিলেন; রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। এই যুগকে বাঙ্গলার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। যে বাঁশী একদিন বাঙ্গলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সুরে বাঙ্গলার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন-মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত গিয়াছিল, তাহার ধর্ম্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। রামপ্রসাদের মাতৃভাবে, বাঙ্গলা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। কখন্ মা আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে যাইতেছেন, কখন্ কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন কোলের ছেলেকে হারাইয়া মা পাগলিনীর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—

"আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়"

বাঙ্গলার সেই আলিপনা দেওয়া ঘর, সেই তুলসীর বন। সেই গৃহস্থের আঙ্গিনা, সেই মৃদুল মধুর বাতাস বহিয়া যায়।

তার পর নিধু, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবি-ওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই সেই কল্পকলার রূপান্তরে পৌঁছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজু গোসাই, তিনি কতকটা রামপ্রসাদের ছাঁদ, ধরণ লইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত অবস্থায়, নিজেকে সে রূপান্তরে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। তাহার পর নিধু বাবুর গান। তাঁহার এক নূতন কথা, নূতন ভাব, ভাষার দিক্ দিয়া দেশের জীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাঁহাতেই প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি গাইলেন,—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥"

তখন হইতে বাঙ্গলা জাগিতে শিখিয়াছে। সে গানের যুগের অবতার, সাধক রামপ্রসাদ। পূর্ব্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল, তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মত গান আসিতে লাগিল। আবার সেইরূপ প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু গাইলেন,—

"তারে দেখ্‌তে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন ॥
তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানি না কি গুণ ॥"

আবার—

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্কচ্ছলে॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে॥

এই মিঠে ভাষা এই বাঙ্গলার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু শোরির পাঞ্জাবী মুসলমানী টপ্পার অনুকরণে, সেই সকল সুরের ধরণে, এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিয়াছিলেন, এই গানগুলিকেও লোকে নিধুর টপ্পাই বলে। কিন্তু সুরের মুসলমানী ঢঙকে এমন আপনার করিয়া লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন,—

"না হতে পতন তনু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুঃখ-তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে॥

ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, সুরের অতি মিঠা রস আছে, বাঙ্গলার ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যাসুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন মিঠা গান আর হয় নাই। তাহার পর রাসু নৃসিংহের গান,—

"সখি এ সকল প্রেম, প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়॥
সুহৃদ ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হতে হয়॥
এমন পীরিত করি যাতে তরি দুদিক্
ঐহিক আর পারত্রিক।

*　　*　　*

"মন মধুব্রত হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায়।"

ইহাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর হরু ঠাকুরের গান—

"নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে (ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে ॥

*　　*　　*　　*

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥

*　　*　　*　　*

বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বই ত নই (ওগো প্রাণ-সই)
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই ॥

*　　*　　*　　*

কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন আশ
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥"

হরু ঠাকুর গাইলেন, তোমরা কেউ জলে ঢেউ দিও না, আমার প্রাণকিশোর অখণ্ড চাঁদ যে তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। নির্ম্মল জলে, নির্ম্মল হৃদয়ে অনিমিষে তাকাইয়া থাকি। * * যার এমন প্রেম, কুলের ভয় নাই, লাজের ভয় নাই, তার মরিবার ভয়ও নাই।

তাহার পর রাম বসুর গান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।" রাম বসুর গানে বাঙ্গলার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আজ' পর্য্যন্ত হইল না।

"দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই
কিছু কাল থাক, থাক বোলে ধরে রাখ্‌বো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না॥"

এ সকল গানের তুলনা হয় না। তাহার পর—

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল
সরমে মরম কথা কহা গেল না—
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে—
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে—
সখি ধিক্ থাক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন আর করে না॥"

রাম বসুর গানের অনুকরণে আজ কত গানই না বাঁধা হইল, কিন্তু তেমনটি আর হয় না। তেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে মরম কথা বলিবার ধরণ আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর বাঙ্গলায় আর এমন গান-বাঁধিয়ে জন্মায় নাই—

চণ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা-স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখীরা বলিল,—

"রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনি
অমন করে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি,
*　　　*　　　*
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো
কত কণ্টক আছে গো বনে—
—(দেখে চল গো কমলিনী)"

দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—

আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি ?
"যখন নব অনুরাগে　　　হৃদয় লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে
(যা যা কর্‌তে হবে গো আমার সখি বঁধুর লাগি)
'জানি' প্রেম করে রাখালের সনে,　　　ফির্‌তে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে (সখি আমার
—যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বাঁশী)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল,　　　করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম ; (সখি আমার চল্‌তে
—যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে)

হইল আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম (সদায় আমায়
—ফির্‌তে যে হবে গো,—কত কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলাম কত ;
(যতন করে গো—ভুজঙ্গ-দমন লাগি)
বঁধুয় লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত ! (হায় ! সে সব
—বৃথা যে হলো গো—সখি আমার করম দোষে)"

এমন সরল গতিতে সরল কথায় জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না।

কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব গীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডিদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, যদি এই তিনের সাধ্যভাব এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে মূর্ত্তি জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্প-কলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গলা উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, চণ্ডিদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণকমলের "স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলার মাটীতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাঙ্গলার মাটীতে কি একে —সেই তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধাভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা

গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-রস ছাঁকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ জাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্যেও তাই! রাধিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির রূপে রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্মৃত হইয়া বঁধু পাইবার জন্য তাহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণ কমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।

বাঙ্গলার মধ্যযুগের 'গানের যুগের' এই বিচিত্র ভাব-সম্পদের কথা আমি এইখানেই শেষ করিলাম। তার পর অন্ধঘন মসীময় আকাশ,—আর নাই। বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোক, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল। বাঙ্গলা চিরদিন পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য যায় না, বাঙ্গলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তার পর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি "রূপান্তরের" কথা বলিয়াছি, আজও পর্য্যন্ত আমাদের এই যুগের গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। ঈশ্বর

গুপ্তের লেখার কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' সেই পর্দ্দার কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতার শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিষ লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের "মহিলা", বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল" আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাবে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা হইয়াছে কি না, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ—যাঁর

"সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।"

সেই পুরাণ সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙ্গলায় ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে সেই রূপান্তরে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলেরই লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাঙ্গলা জাগিতেছে। দিনের লাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গলা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

[illegible] প্রেস, কলিকাতা।

দর্শন-শাখার সভাপতি

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্‌-এ, বি, এল্‌,

মহাশয়ের অভিভাষণ

সমবেত সুধীবৃন্দ !

অদ্য আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত আসন প্রদান করিয়াছেন ; এজন্য আপনাদিগের বিচার-বুদ্ধির সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও আপনাদিগকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুপণ্ডিত কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ মহাশয় যখন আমাকে বর্ত্তমান সম্মিলন-উপলক্ষে দর্শন-শাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন আমি নানা কারণে উক্ত গুরু ভার বহন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করি। কিন্তু তাহার পরে তিনি এবং আমার অন্যান্য কতিপয় সুহৃৎ এই প্রসঙ্গে অনুরোধ করায় আমি নিরুপায় হইয়া নিজ অযোগ্যতা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াও তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। যখন সুহৃদ্‌গণের অনুরোধ ত্যাগ করা অসাধ্য হইল, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, সভায় নানা সুধীগণের সমাগম হইবে ; তাহাতে সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার কোন বাধা ঘটিবে না ; এবং আমার ন্যায় অকৃতী ব্যক্তির জন্য সভার কার্য্যে কোন প্রকার হানি হইবে না। সভার কার্য্য সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীই করিবেন ; অধিকন্তু ঐ সুযোগে আমার কতিপয় নিবেদন আপনাদিগকে জানাইবার সুবিধা হইবে। দর্শন-শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলেও উহার আলোচনায় বহুদিন হইতেই আমার অনুরাগ আছে ; অতএব এই অনুরাগ-বশতঃ কয়েকটী কথা আমার মনে অনেক দিন হইতে জাগরূক রহিয়াছে। আপনাদের প্রদত্ত বর্ত্তমান আসনে বসিয়া সেই কথা গুলি বলিলে হয়ত দেশের নিকটে আমার কথাগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা

হইবে এবং তৎসম্বন্ধে একটী সুসিদ্ধান্ত হইয়া আমার চিরপোষিত প্রস্তাব গুলির মধ্যে যে গুলি সুধীসমূহের গ্রহণীয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার একটী ব্যবস্থা হইবে, এবং পক্ষান্তরে আমার প্রস্তাব গুলির মধ্যে যে গুলি সুধীগণের পরিত্যাজ্য, তৎসম্বন্ধে ঐ প্রস্তাব গুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের অনুকূল অন্য প্রস্তাবাদি আলোচিত হইয়া সে গুলিও যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাও সুধীগণ অবশ্য করিবেন, ইহাই আশা করি।

সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত আশায় সাহসী হইয়া আমি অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি আরও আশা করি যে, আমার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষগুলি আপনারা কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং ইহার প্রয়োজন কি? বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ইহার সম্যক্ আলোচনা কি ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপে ধারাবাহিক-রূপে এখানে ব্যক্ত করিব।

দর্শন-শাস্ত্র কাহাকে বলে, ইহার লক্ষণ করিতে যাওয়া দুঃসাধ্য। বহুদিন হইতেই দার্শনিকগণ নানা-ভাবে ইহার লক্ষণ করিয়াছেন। এই সমস্ত লক্ষণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই :—কোনও পদার্থ বিশেষ বা তদ্গত ধর্ম্মাদি আশ্রয় না করিয়া আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব ব্যাপিয়া যে সকল প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে মনন এবং সমাধান করাই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বিশেষ বিশেষ পদার্থ এবং তদ্গত ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা দর্শন-শাস্ত্রের অবান্তর উদ্দেশ্য-মধ্যে

পরিগণিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা কখনও দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

এই কথাগুলি আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ যতদিন ভাবিতে বা চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, ততদিন হইতেই পরিস্ফুট-ভাবে হউক, আর অপরিস্ফুট-ভাবেই হউক, মানুষ দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। "আমরা কে," "কোথা হইতে আমরা আসিয়াছি," "কোথায়ই বা যাইব," "আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থই বা কি প্রকার?" "ইহাদেরই বা উৎপত্তি কোথা হইতে" এবং "ইহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি প্রকার?" ইত্যাদি প্রশ্ন, আমাদের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিকটে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তরও বিবিধ মনীষিগণ বিবিধ-প্রকারে দিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। মানুষের মন যতদিন আছে, ততদিন মনন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, এবং মনন আছে বলিয়াই মানুষ ইতর প্রাণী হইতে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত। অতএব মানুষের সৃষ্টিরও যেমন কাল নিরূপণ করা যায় না, তদ্রূপ মানুষ কত দিন হইতে যে মনন (যাহা হইতে যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে) করিতেছে, তাহারও কোন আদি কাল নির্দ্দেশ করা যায় না।

অবশ্য এই প্রকার মননের ফল সকল যে দেশে যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হওয়া দুর্ঘট। কারণ সকল স্থলে লিপি পাওয়া যায় না; পাইলেও দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে ইহার মর্ম্মার্থ নিষ্কাশন করা অতীব দুরূহ। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনন হইতেই দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি। কেবল দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি কেন, যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি। যাঁহারা Revelation মানেন,

তাঁহারা বলিতে পারেন, যে পরমেশ্বর মানব-জাতির প্রতি অনুকম্পা বশতঃ মূল পদার্থের তত্ত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ঋষিগণের নিকটে উদ্ভাসিত করিয়াছেন; তদনুসারে ঐ সকল ঋষি Revealed truth গুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমার বক্তব্য এই যে, Revealed truth সকল বেদ, বাইবেল বা কোরাণ সরিফ্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিলেও উক্ত তথ্য-সমূহ আমরা উপপত্তি-পূর্ব্বক স্বকীয় মনে আয়ত্ত করিতে না পারা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ঐ সকল তথ্য বিচার-পূর্ব্বক নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উপপত্তি করিয়া মনে মনে স্বীকার না করা পর্য্যন্ত উহাকে আমাদের ঠিক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। অতএব ফলে দাঁড়াইতেছে যে Revealed truth গুলিও আমাদের মননের বহির্ভূত নহে।

এখানে একটী কথা এই যে, সকল বিজ্ঞানের মূল মনন এবং দর্শন-শাস্ত্রের মূলও মনন; কিন্তু এই দুই প্রকার মননের বিষয়-গত বিশেষ পার্থক্য আছে। কোন জাগতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সেই বিষয়ে বিশেষ-ভাবে মনন করা প্রয়োজনীয়। মনে করুন, জড়-বিজ্ঞান এবং উহার অন্তর্গত তড়িদ্-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান দৃষ্টিবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার অর্থ এই যে, জাগতিক কোন একটী পদার্থ বা তাহার কোন একটী ধর্ম্ম লইয়া তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা ও অন্বীক্ষাদি দ্বারা তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান-লাভ করা। উক্ত প্রকারে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের মননকে নিবদ্ধ করিতে হয়; এবং বহুদিন বহুভাবে মনন করার পর ঐ সকল বিষয়ে নানা প্রকার জ্ঞান-লাভ করা যায়। ঐ প্রকার লব্ধ জ্ঞানকে আপনাদিগের কিংবা সকলের

প্রয়োজনানুসারে নিযুক্ত করিয়া সংসার-যাত্রার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ঐ সকল স্থলে "বিজ্ঞান" না বলিয়া খণ্ড-জ্ঞান বলাই আমার অভিমত। জগতে কোন একটী পদার্থের কিংবা কোন পদার্থের কোন এক বা কতিপয় ধর্ম্মের বিশেষ জ্ঞানকে তত্ত্ব-জ্ঞানের দৃষ্টিতে খণ্ড-জ্ঞান না বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। প্রাচীন পারিভাষিকের প্রথানুসারে ঐ সকল শাস্ত্রকে জড়-তত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব ইত্যাদি বলিলেই সুসঙ্গত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী Science শব্দের অনুকরণে ঐ সকল বিদ্যার নাম "বিজ্ঞান" হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, কোনও একটী পদার্থের বা তাহার কোন এক বা কতিপয় ধর্ম্মের বিশেষ জ্ঞানই (Science এর) প্রতিপাদ্য বিষয়। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, কোনও এক বিশেষ বিজ্ঞানে এক একটী বিষয় বা তদ্গত ধর্ম্মেরই আলোচনা হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ের বা তদ্গত ধর্ম্মের আলোচনা ঐ বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত নহে। কিন্তু এমন কোন বিশেষ জ্ঞান কি নাই, যে সমস্ত খণ্ড-জ্ঞানের সমবায় বা সমন্বয় যাহার প্রতিপাদ্য বিষয়? আমি হয়ত চিকিৎসা-বিদ্যা তড়িদ্-বিদ্যা প্রাকৃতিক-বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যা অর্জ্জন করিলাম; তখন আমার মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিবে যে, আমি যে সকল বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি পরস্পর বিভিন্ন, বা তাহারা পরস্পর কোন সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ? উহারা যে পরস্পর বিভিন্ন নহে, কিন্তু পরস্পর সম্বদ্ধ তাহা Metaphysicsএর মূলোচ্ছেদকারী অগস্ত কোম্‌তকেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি Positive Philosophy বলিয়া যাহা মানব-জাতিকে উপহার দিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "The different sciences are distinct from one another, but they are not

isolated. Apprehending phenomena in their mutual relations they tend by their very progress to form a whole and to become a science." বিভিন্ন বিজ্ঞানের (scienceএর) প্রতিপাদ্য বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও তাহারা পরস্পর অসম্বদ্ধ নহে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের (scienceএর) পৃথক্ পৃথক্ প্রতিপাদ্য বিষয়ের তথ্য অবগত হওয়ার পর উক্ত জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অংশ-জ্ঞান লইয়া এক অংশীর জ্ঞান সাজাইতে আমাদের ইচ্ছা স্বতই বলবতী হয়। এই সকল বিষয় একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য মনীষী Herbert Spencer দর্শন-শাস্ত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে, "The truths of philosophy bear the same relation to the highest scientific truths that each of them bears to lower scientific truth. As each widest generalization of science comprehends and consolidates those narrower ones of its own division, so the generalisations of Philosophy comprehend and consolidate the widest generalisations of science. It is the final product of that process which begins with a mere colligation of crude observations, goes on establishing propositions that are broader and more separated from particular cases and end in universal propositions. In its simplest form knowledge of the lowest kind is *Ununified knowledge*; Science is a *partially unified knowledge* and Philosophy is *completely unified knowledge.*"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, Herbert Spencer বিজ্ঞান (Science) এবং দর্শনের (Philosophy র) মধ্যে অংশাংশি ভাবটী কি ভাবে বুঝিতেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণও এই কথাটী অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা দর্শন-শাস্ত্রের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, দৃশ্যতে জ্ঞায়তে পরমার্থতত্ত্বং অনেন ইতি দর্শনম্। পরমার্থতত্ত্বঞ্চ দর্শন-ভেদেন বহুবিধং, পরন্তু পরমার্থতত্ত্বরূপসাধারণধর্ম্মসামর্থ্যাৎ সর্ব্বেষাং দর্শনমিতি নাম। তত্ত্বজ্ঞান বলিতে যাহাকে ধরা যাইবে, তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের কোন উপাধি থাকে না, অর্থাৎ কোন বিষয়-বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া যেখানে সামান্যাকারে তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হয়, সেখানে কোন বিষয়ের জ্ঞান (যাহাকে খণ্ডজ্ঞান বলা যায়) না বুঝাইয়া ঐ সকল খণ্ডজ্ঞানের উপর সাধারণ-ভাবে জগৎ কি? আমাদের সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধ কি? আমাদের ও জগতের উৎপত্তি কোথায়? এবং আমাদের পরিণতিই বা কি প্রকার? ইত্যাদি ব্যাপক পদার্থের জ্ঞানকেই বুঝায়। এই সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের জন্য আমাদের মনন নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং বুঝা গেল যে, মনন ব্যতীত কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যখন আমরা কোন পদার্থ-বিশেষের বা তদ্গত কোন ধর্ম্মের মননাদি করিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করি, তখন সেই জ্ঞানকে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সসীমত্ব প্রযুক্ত, খণ্ড-জ্ঞান বলিতে হয়। তদ্রূপ যখন আমরা ঐ সকল খণ্ড খণ্ড পদার্থ বা তদ্রূপ ধর্ম্মের বিষয় অতিক্রম করিয়া এতদপেক্ষা ব্যাপক পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার বাসনা করি, তখন আমাদিগকে দর্শন শাস্ত্রের সহায়তা লইতে হয়।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মনন করিতে হইলে তাহার

কতক গুলি সাধারণ সূত্র আছে, তাহা বুঝিবার জন্য মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব-নামক শাস্ত্র আলোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব, দর্শন-শাস্ত্রের অন্তর্গত, কিংবা বিজ্ঞানের (science এর) অন্তর্গত হইবে? এক হিসাবে ইহা বিজ্ঞানের অন্তর্গত হওয়াই উচিত, কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, যাহা কোন বিশেষ পদার্থ বা তদ্গত ধর্ম্মের জ্ঞাপক, তাহাকেই Science বলা বিধেয়।

মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব বলিলে মন কি এবং তাহার ক্রিয়া-প্রণালী কি প্রকার, ইহারই আলোচনাকে বুঝায়। সুতরাং প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাপক হইল না, ব্যাপ্যই হইল। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপ্য বিষয়ের জ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞানের বা মনস্তত্ত্বের পার্থক্য এই যে, অন্যান্য বিষয়ের বিজ্ঞান গুলি মূলতঃ পরস্পর সম্পৃক্ত নহে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্র গুলি তদ্রূপ নহে। যে কোন বিজ্ঞানেরই আলোচনা করা যাউক না কেন, মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্র-গুলি সকলেরই উপজীব্য। কোনও বিষয়সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ে বিশেষ-ভাবে মনন করিতে হয়; এবং মনন-ক্রিয়া তদ্বিষয়ক মূল-সূত্রের পরি-চালন সাপেক্ষ। অতএব মনো-বিজ্ঞানেতর সকল বিজ্ঞানের আলোচনাই পরিস্ফুট-ভাবেই হইক, আর অস্ফুট-ভাবেই হউক, মনোবিজ্ঞানের প্রণালী-অনুসারে সম্পাদিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন ভাবে হইতে পারে না।

এই কারণেই অথবা মনোবিজ্ঞানের এই প্রকার বিশিষ্টতা হেতু মনোবিজ্ঞানের স্থান দর্শন এবং বিজ্ঞানের (Seience এর) মাঝা-মাঝি। এমন কি মনোবিজ্ঞানের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের এ প্রকার ঘনিষ্টতা-সম্বন্ধ-সূত্রেই কোনও কোনও দার্শনিক দর্শন-শাস্ত্র এবং মনো-

বিজ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্য দেশীয় Locke এবং Reid প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক-গণের নাম করা যাইতে পারে। অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমান করিলে একথা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইবে যে, মননই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ; ইহার আদি ও অন্ত মনুষ্যত্বের সহিত সমকালস্থায়ী।

আমি এতদূর যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা হইতে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে। মনন মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে দেশে বা যে কালে মানুষ ছিল, সেই দেশে বা সেই কালে মানুষেরা মনন করিয়া দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। কোন স্থানে বা উহার কতকগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং হয়তঃ কত সিদ্ধান্ত কথা লিপিবদ্ধ না হইয়া কিংবা লিপিবদ্ধ হইয়া কালবশতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে যতগুলি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ-ভাবে বা গুরু-পরম্পরা-ক্রমে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করিলে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশে যে অবস্থায় ঐ সকল সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে, তাহার গবেষণা করিলে মানব-জাতির এক অপূর্ব্ব ইতিহাস বাহির হইতে পারে। মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি এক-প্রকার এবং একজাতীয় হইলেও জগদীশ্বরের সৃষ্টিতে প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের এবং প্রত্যেক জাতির মননের ধারায় কিছু না কিছু বিচিত্রতা আছে। এই বিচিত্রতার সূত্র ধরিতে পারিলে জগতের প্রধান প্রধান জাতির চিন্তা-প্রণালী এবং তাহাদের মননানুযায়ী সিদ্ধান্ত সকলের রহস্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনন

লইয়াই মনুষ্যত্বের আরম্ভ। এই সকল বিভিন্নযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তি-গণের চিন্তা-প্রণালী এবং মনন-মূলক সিদ্ধান্তের রহস্যগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের মনন-কার্য্য এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি (যাহা মানবমাত্রেরই জিজ্ঞাসার বিষয় এবং যাহার সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তারতম্যের উপর আমাদের ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত ভাল-মন্দ সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করিতেছে তাহা লইয়া) আলোচনা করিবার পক্ষে যে অশেষ উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বলা বা লেখা যত সহজ, উহা কার্য্যে পরিণত তত সহজ নহে। এই কার্য্যের জন্য আমাদের দেশের সকল সুধীবর্গের সমবেত চেষ্টা করা আবশ্যক। এই কার্য্যের কিঞ্চিৎ সাফল্য-লাভোপযোগী চেষ্টা হওয়ার পক্ষে যদি "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন" কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারেন, তবেই সম্মিলনের অধিবেশন সার্থক হইবে। কার্য্য-ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হইলেও ইহাতে ভীত হইবার কারণ নাই। যে দেশে রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় দার্শনিক-গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে দেশে বর্ত্তমান যুগেও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, মনস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এবং প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ আছেন, সে দেশে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা-সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ বোধ হয় নাই। বর্ত্তমান কালে দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইলে আমাদিগকে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ আধুনিক লোকের মনঃপূত হইবে না, অন্ততঃ হওয়াও উচিত নহে। আমাদের দেশে ইতঃপূর্ব্বে দর্শনাদি-শাস্ত্রের চর্চ্চা বিশেষ-ভাবে সংস্কৃত ভাষাতেই হইত; কারণ তদানীন্তন কালে শিক্ষিত ব্যক্তি-

বর্গের ভাব-বিনিময় ঐ ভাষাতেই হওয়ার প্রকৃষ্ট সুবিধা ছিল। তখন বিদ্যা-চর্চ্চা সীমাবদ্ধ থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের মধ্যেই উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ছিল। জ্ঞানের প্রসার-বৃদ্ধি বর্ত্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ; অর্থাৎ বহুলোকেই এখন জ্ঞান-প্রত্যাশী। এখন সকলেই সকল বিষয় জানিতে চাহে। এই প্রবৃত্তি ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার অনাবশ্যক। যাহা বর্ত্তমান কালে সার্ব্বজনীন ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার বিরোধী হওয়া একপ্রকার বাতুলতা মাত্র। এই যুগের এই প্রবৃত্তির বিষয় অতি সুন্দর-ভাবে অথচ সংক্ষেপে Huxley Aberdeen University তে তাঁহার Rectorial Address দিবার সময়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে:—"Men would insist on re-opening all questions and asking all institutions, however venerable, by what right they exist and whether they are or are not in harmony with the real or supposed wants of mankind" বর্ত্তমান যুগের মানুষের এই প্রবৃত্তি এবং এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে না পারিলে কোন শিক্ষা বা কোন শাস্ত্রের চর্চ্চা ফলবতী হইবে না। অনেকে বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ব যুগে যাহা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা সম্পাদিত হইত, বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে ইংরাজী-ভাষা দ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারিবে না কেন? এই প্রকার প্রশ্ন আমার নিকটে কিন্তু অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হয়। কেহ কি বস্তুতঃ মনে করেন যে, এই দেশের সকল লোকেই ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইবে? না হওয়া প্রার্থনীয়? ইহা যখন সম্ভবপর বা সঙ্গত নহে, তখন আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা এবং দর্শন-শাস্ত্রাদির চর্চ্চা আমাদের মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়েসন্দেহ হইবে কেন? বিশেষতঃ প্রকৃত-ভাবে আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে

যে, মাতৃভাষায় আলোচনা না করিলে কোন শিক্ষা দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান-বিস্তার হইতে পারে না।

এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান কালে কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছে; সম্প্রতি একটী বড় হাস্যজনক কথা শুনা গিয়াছে। শুনা গিয়াছে যে, উচ্চ শিক্ষায় নাকি এমনই একটী আভিজাত্য আছে, যাহা আমাদের মাতৃভাষার সংস্পর্শে আসিলে ম্লান হইয়া যাইতে পারে। দুঃখের কথা এবং লজ্জারও কথা যে, এই প্রকার অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য কোন সুধী ব্যক্তি পোষণ করিতে পারেন; লজ্জার কথা এই যে, এই মতের অনুবর্ত্তী নাকি আমাদের দেশেরও কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি। দেশের যখন অধঃপতন হয়, তখন এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। আমি দূর হইতে ঐ সকল ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া থাকি, এবং শ্রীভগবানের নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন ইহাঁদের মত এদেশের জল-বায়ুকে আরও দূষিত না করে। মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে বৈদেশিক ভাষায় উচ্চ বিষয়ে ভাবের আদান প্রদান হইলে কি অনিষ্ট ঘটে, তৎসম্বন্ধে একজন বৈদেশিক কি বলিয়াছেন, তাহা আপনাদিগকে অবগত করাইবার জন্য এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলেন যে, "The defect of using a foreign language as a man's principal means of expression is that it tends to beget a second-hand use of borrowed and imperfectly assimilated thought, because with borrowed thought can be used easily borrowed language." যে ভাবের assimilation অর্থাৎ প্রকৃত-ভাবে উপপত্তি হয় না, তাহা কেবল ভার মাত্র; তাহা দ্বারা কাহারও প্রকৃত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। আমি জানি, "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের" প্রধান উদ্দেশ্য মাতৃভাষার প্রসার বৃদ্ধি করা;

সুতরাং আসুন, এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া যাহাতে বঙ্গভাষায় উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়, এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন আমাদের মাতৃভাষায় প্রচলিত হয়, তাহার জন্য আমরা সকলে বদ্ধ-পরিকর হই। এই সম্বন্ধে যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা যে, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার প্রচলন করিতে হইলে যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহাদের অভাব আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে বিরাজমান। ঐ সকল অভাব দূরীভূত না হইলে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মাতৃভাষায় উচ্চ-শিক্ষা-সম্বন্ধে পঠন পাঠনের প্রণালী অবলম্বন করাই এই সকল অভাব-দূরীকরণের প্রকৃষ্ট উপায়। উহা ব্যতীত কোন ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। অনেকে আরও অনুমান করেন যে, মাতৃভাষায় সুশিক্ষা প্রচলিত হইলে শিক্ষার্থীর অভাব হইবে। আমার বিশ্বাস অন্য প্রকার। এই দেশস্থ অধিবাসিগণের এখন যে প্রকার মতি-গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, শিক্ষার্থীর অভাব ঘটিবে না। সকলে এমন কি অধিকাংশ লোকেই যে ইংরাজী কিংবা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইবেন, ইহা কোন কালে সম্ভব নহে; কিন্তু অধিকাংশ লোকের এখন জ্ঞান-পিপাসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে এবং অনেকেই এখন অনেক বিষয় জানিতে চাহেন। এই শ্রেণীর লোকের আকাঙ্ক্ষা দূর করিবার কি কোন উপায় আমরা করিব না? যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলে আমাদের কি শিক্ষিত হইবার অভিমান বৃথা নহে? আমার মনে হয় যে, জ্ঞানের পথে ভাষা-সম্বন্ধীয় কোন প্রতিবন্ধক থাকা উচিত নহে। আমরা সকলে বাঙ্গালী, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা; আমাদের যাহা কিছু জানিতে বা বলিতে বাসনা জন্মে, তাহা আমরা যদি বাঙ্গলা

ভাষা দ্বারা জানিতে বা বলিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় দুরদৃষ্ট জগতে আর দ্বিতীয় হইতে পারে না। আমি বাঙ্গালী; বাঙ্গালা ভাষায় আমার সকল কথা বুঝা আমার পক্ষে সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু আমাকে যদি কোন বিষয় বুঝিতে অন্য ভাষা বিশেষতঃ বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি, আমার প্রতি এই অত্যাচারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং গুরুতর অত্যাচার। যত শীঘ্র বঙ্গদেশবাসীর প্রতি এই ভীষণ অত্যাচার দূরীভুত হয়, তাহা করা শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় দর্শনাদি শাস্ত্র আমাদের মাতৃভাষায় আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে যত সহজ, এমন কি সংস্কৃত ভাষায়ও তদ্রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃত-ভাষার দুহিতাই হউক, বা দৌহিত্রীই হউক, সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার একটী রক্তের সংশ্রব আছে। এই সম্বন্ধ অন্য ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার নাই। সুতরাং আমাদের দেশীয় দর্শন-শাস্ত্র যখন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তখন ঐ সকল দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুগম। অনেক অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছি যে, এদেশে সংস্কৃত টোলে মাতৃ-ভাষার সাহায্যে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার এই সকল কথার মধ্যে যদি কিছু সার থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে যে, সংস্কৃত-ভাষায় এবং তদনুগত ভাষা-সমূহে দর্শনাদি শাস্ত্রের যে সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অতি নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা, এবং তৎসম্বন্ধে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাহাতে বঙ্গভাষায় অচিরেই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। মাতৃভাষার পঠন পাঠন আরম্ভ হইলেই ভাষা-সম্বন্ধে এখন যে সকল সন্দেহ আছে, তাহা দূরীভূত হইবে, এবং একদিন যেমন সহজে সংস্কৃত-

ভাষায় দুরূহ দার্শনিক-বিষয়ের আলোচনাদি এবং গ্রন্থাদি রচিত হইত, তদ্রূপ বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইবে এবং ঐ সকল শাস্ত্র আলোচনা করিবার উপযোগী ভাষাও সৃষ্টি হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় পারিভাষিক শব্দাদি লইয়া যে সমস্ত আপত্তির বিষয় আছে, তাহাও নিবারিত হইবে; কোন ভাষায় কোন শাস্ত্রের পঠন পাঠন আরম্ভ না হইলে সেই ভাষায় ঐ ঐ শাস্ত্র সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না,—ইহা সাধারণ সত্য;—ইহার ব্যভিচার কুত্রাপি হয় নাই; এবং এদেশেও হইবার নহে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য দেশের দর্শন-শাস্ত্রাদি আলোচনার জন্য ইংরাজী গ্রন্থাদি পাঠ করা ব্যতীত কিছুদিন আমাদের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আশা করি, আমাদেরও এমন দিন আসিবে, যখন আমরা গ্রীক, ল্যাটিন এবং ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ-ভাবে অভিজ্ঞ হইয়া তৎতৎ ভাষায় রচিত মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া তৎতৎ ভাষায় নিহিত দার্শনিক তত্ত্বগুলি আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব এবং ঐ জন্য আমাদের বর্ত্তমান কালের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। আপনারা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন, স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষায় মূল বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়া এদেশীয় অনেক পাদরী সাহেবকে নিরুত্তর করিতেন। আমাদেরও এ ক্ষেত্রে ঐ মহাত্মার অবলম্বিত পথ আদর্শ-স্বরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যতদিন আমাদের ঐ প্রকার সৌভাগ্যের উদয় না হইতেছে, ততদিন অবশ্য আমরা ইংরাজদের নিকটে এই বিষয়ে ঋণী থাকিব।

কিন্তু আমাদের মাতৃভাষায় দেশীয় দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিলম্ব করার কোন কারণ দেখা যায় না। মাতৃভাষায় দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইলে আর এক সুফল অবশ্যম্ভাবি। আমাদের

দেশের যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত-ভাষার তাদৃশ আলোচনা করেন নাই; তাঁহারা ইংরাজী ভাষার সাহায্যে অবশ্য এদেশের দর্শন-শাস্ত্রের স্থূল স্থূল অংশ কথঞ্চিদ্‌ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভিন্ন দেশের ভাষায় আবৃত থাকায় এবং উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে এতদ্দেশীয় দর্শন-শাস্ত্র যে তাঁহাদের বাঞ্ছিত মত শিক্ষা করা হয় নাই, ইহা বোধ হয় তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিবেন। তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি করিবার কি কোন উপায় হইবে না? আর আমাদের দেশে যাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজী-ভাষায় অব্যুৎপন্ন লোকের সংখ্যা আরও অধিক, এবং তাঁহাদের নিকটে পাশ্চাত্য দর্শনের কথা এক প্রকার অপরিচিত। ইঁহাদের যে প্রকার মেধা এবং ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি এতই বলবতী যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলী শিক্ষার সুযোগ পাইলেই পাশ্চাত্য-দর্শনে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য নিশ্চিত সমুৎসুক হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তির কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমাদের কি কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা তাঁহাদের এই জ্ঞান-পিপাসা উপযুক্তভাবে উদ্রিক্ত করি এবং তাঁহাদের অবশ্য-সম্ভাবিত আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির উপায় করি? আমাদের দেশের নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিক পণ্ডিত মহাশয়েরা কি চিরকালই Socrates, Plato, Aristotle, Spinoza, Leibneitz, Hegel, Herbert Spencer এবং Bergson, প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মনীষীর চিন্তা-প্রসূত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিবেন? পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ উপাধিধারী যুবকবৃন্দ চিরকালই কি ব্যাস, গৌতম, শঙ্কর, রামানুজ, গঙ্গেশ, রঘুনাথ, গদাধর, জীবগোস্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায়

প্রতিভাশালী ঋষিকল্প ব্যক্তিবৃন্দের চিন্তাপ্রণালী ও তাঁহাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে কেবল ইংরাজী অনুবাদের উপর নির্ভর করিবেন? এবং ঐ প্রকারে লব্ধজ্ঞান কিংবা জ্ঞানাভাসে পরিতৃপ্ত থাকিবেন? মাতৃভাষায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইলে এই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা হইবে; অন্য উপায়ে তাহা হইতে পারে না। এইস্থলে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য একটী বিষয়ের উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। ভারতীয় বিদ্যার অনুশীলন এবং ভারতীয় জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কতদূর কি করিয়াছেন, ইহা একবার সমালোচনা করার সময়, বোধ হয়, এতদিনে আসিয়াছে। কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতীয় দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিষয়ে গবেষণা সম্বন্ধে আশানুরূপ কোন কার্য্যই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। শুনিয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জাপান প্রভৃতি দেশের দর্শনশাস্ত্রগুলি সম্যগ্‌ভাবে আলোচনাদি করিবার জন্য তথায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রকার উদ্যম বা উৎসাহ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কি একবার বিবেচনা করা উচিত নহে যে, তাঁহাদের ঐ কার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিবার পূর্ব্বে অন্যবিধ গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের কি বুঝা উচিত নয় যে, ভারতের দর্শন-শাস্ত্রীয় মতবাদগুলি দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত সমাজে উহা এক প্রকার অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। সেইগুলি উদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের নিকট তাহা উপস্থাপিত করা তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এদেশের জ্ঞানভাণ্ডার যাহাতে এদেশের লোকের জন্য উন্মুক্ত হয়, এবং ক্রমে বর্ত্তমান কালেও শিক্ষিত ব্যক্তি-

গণের দ্বারা ঐ অক্ষয়-ভাণ্ডার-নিহিত রত্নগুলি যাহাতে সর্ব্বত্র সমস্ত শিক্ষিত মানব-মণ্ডলীর ব্যবহারে আসিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একপ্রকার উদাসীন। সত্য বটে, সংপ্রতি এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের কথঞ্চিৎ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু এই ক্ষীণ চেষ্টা বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিচার করিলে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। এই সম্বন্ধে অবশ্য আমরা অল্প দোষী নহি। আমাদের যদি এই বিষয়ের গুরুত্ব প্রকৃত-প্রস্তাবে উপলব্ধি হইত এবং আমাদের হৃদ্বোধানুযায়ী প্রয়োজনীয়তা ভাল করিয়া বুঝান হইত, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা-সম্বন্ধে এখানে যাহা বলিলাম, ভারতীয় পুরাতত্ত্বসম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথাই প্রযোজ্য। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কিছু কিছু এতৎ-সম্বন্ধে করিতেছেন এবং স্বনামধন্য মহাত্মা Tata প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মবীরের দ্বারা কিছু কিছু কাজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই সম্বন্ধে কিছু না করা কি সমীচীন হইতেছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যে Motto রহিয়াছে, তাহার সহিত এই প্রকার নিশ্চেষ্টতার কি সামঞ্জস্য সাধিত হয়? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় Advancement of Learning এই উদ্দেশ্য লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাই সূচিত করিবার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে স্বর্ণাক্ষরে ঐ কথাটা লিখিত আছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনাদি শাস্ত্র এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণাদি বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন ও বর্ত্তমানে সামান্য যাহা কিছু করিতে-ছেন, তাহা কি প্রচুর বলিয়া তাঁহারা বলিতে পারেন? আমি আপনাদের

নিকট দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনা করিবার জন্য যে সকল কথা বলিলাম, তাহা যদি আপনারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে আমাদের কি কি প্রয়োজন? আমি আমার বক্তব্য এই স্থলে কেবল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ করিব। ভারতীয় দর্শন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে ন্যায়দর্শন এবং বেদান্তদর্শনই সর্ব্বপ্রধান। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে উক্ত দুই প্রকার দর্শনশাস্ত্রের কথাই সর্ব্ব-প্রথমে মনে আসে। ঐ দুই দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাদি এত অধিক আছে যে, এক ব্যক্তির সমস্ত জীবনে উহার এক একটী শাস্ত্রসম্বন্ধীয় সমগ্র গ্রন্থাদি আলোচনা করা সম্ভবপর কি না সন্দেহ। প্রাচীন এবং নব্য ভেদে, ন্যায়-দর্শন-সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থাদির মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির প্রায় কিছু না কিছু প্রচলন আছে। তবে অবশ্য সকল গ্রন্থের পঠন পাঠন নাই। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্যক হইলে উপযুক্ত বৃত্তি (Scholarship) দিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপর এক একটী বিষয়ের আমূল আলোচনার জন্য ভার দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের আলোচনার ফল উপযুক্ত কৃতবিদ্য লোক দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। এইভাবে কাজ চলিলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ সকল শাস্ত্রের সমস্ত তথ্যই বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের নিকট বর্ত্তমান সময়োপযোগি ভাবে উপস্থাপিত করিবার সুবিধা ও সুযোগ ঘটিবে। আমাদের মাতৃভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় ঐ সকল আলোচনার ফল প্রকাশিত হইলে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রণালী অল্প-বিস্তর সকলেরই গোচরে আসিবে। বিশেষতঃ যাঁহারা এই ভাবে আলোচনার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদের উপর এরূপ নির্দ্দেশ থাকা কর্ত্তব্য হইবে যে, তাঁহারা ঐ ঐ বিষয়ের আলোচনা-

কালে ঐ সকল বিষয়ে ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিকেরা যে সকল তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহারও বিষয় যেন সম্যগ্‌ভাবে তাঁহারা বিচার করেন। দেখুন, এই ভাবে যদি উপযুক্ত শিক্ষিত ও মেধাবী ব্যক্তিদের দ্বারা ন্যায় শাস্ত্র আলোচিত হইয়া মাতৃভাষায় উহার পঠন পাঠনাদি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ন্যায় শাস্ত্রের নামে যে এক বিভীষিকা এখন লোকের মনে জাগরূক আছে, তাহা দূরীভূত হইবে; এবং সর্ব্ব-সাধারণের নিকট উহার আদর বৃদ্ধি পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য, তাঁহারাও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ন্যায়-শাস্ত্রের মতের সহিত আমাদের দেশের মত উপযুক্ত-ভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দেশের দর্শনাদি শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাঁহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশানুরাগী হইবেন। এখানে ন্যায়-শাস্ত্র-সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, বেদান্তাদি শাস্ত্র-সম্বন্ধেও তাহা প্রায়শঃই প্রয়োজ্য। এখানে কয়েকটী বিশেষ কথা আছে। বেদান্ত-শাস্ত্রের মত লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, তাহার বিস্তার করিয়া এখানে আপনাদের সময় নষ্ট করিতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। অনেকের বিশ্বাস যে, বেদান্ত বলিলেই বেদান্তের অদ্বৈত মতকেই বুঝায়, অন্য কোনও মতকে বুঝায় না। এ কথা যে সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক, তাহা বিশেষ-ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, বেদান্ত-শাস্ত্র বলিতে যে ব্যাপক পদার্থকে বুঝায়, তাহার সম্প্রদায়ভেদে যত গ্রন্থ আছে, তাহার অনুসন্ধান এখনও সম্যগ্‌ভাবে হয় নাই। যে যে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের নাম অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায়, তাহারও বোধ হয় অধিকাংশ পাওয়া যায় না। আমি ৺কাশীধামে এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছিলাম

যে, বেদান্ত-সূত্রের শক্তি-পক্ষে ব্যাখ্যা আছে। এ কথা শুনিয়া অবধি আমি ঐ ব্যাখ্যার বহু অনুসন্ধান করিয়াও অদ্যাপি উহার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি আমার এক জন শিক্ষিত বন্ধুর নিকট অবগত হইয়াছি যে, প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ কয়খানির তান্ত্রিক মতানুযায়ী ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, ঐ ভাষ্যের ভাষা দেখিলে উহা অতি প্রাচীন কালের লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্ন-লিখিত সম্প্রদায়গুলি বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যথা:—১। শঙ্কর সম্প্রদায়, ২। রামানুজ সম্প্রদায়, ৩। মাধ্ব সম্প্রদায়, ৪। বল্লভ সম্প্রদায়, ৫। নিম্বার্ক সম্প্রদায়, ৬। গৌড়ীয় সম্প্রদায় এবং ৭। শৈব সম্প্রদায়। এই সকল সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ এবং টীকা টীপ্পনী এত বিস্তৃত যে তাহা একজনের আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, তাহার তালিকা করিতেই বোধ হয় একজনের জীবনকালের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। তাহার পর সেই গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করাও এক বিরাট ব্যাপার। তাহা ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমাদের গভর্ণমেণ্ট হইতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী কিংবা অন্যান্য জন-সঙ্ঘ ব্যতীত এই কার্য্য উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই। গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট ভাবে না হউক, কথঞ্চিদ্-রূপে প্রাচীন নানা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিতেছেন এবং যাহা পাইতেছেন। তাহা রক্ষা করিবারও সুব্যবস্থা করিতেছেন তজ্জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অবশ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। কিন্তু উহাতে আমি ঠিক যে ভাবে কাজের কথা বলিতেছি, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। ভারতের দর্শন-শাস্ত্রীয় যতপ্রকার গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করা এবং যাহা পাওয়া যাইবে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষা

করিবার ব্যবস্থা করা আমাদের বিদ্বন্মণ্ডলী কিংবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার পর ঐ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য উপযুক্ত সুধীবর্গের উপর ভার দেওয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে আলোচনা করান ও তাঁহাদের আলোচনার ফল সাধারণ শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ করাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। সাম্প্রদায়িক গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি মৌলিক, তাহার অনুবাদ সহ বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া উপযুক্ত সুপণ্ডিত দ্বারা সম্পাদিত ও মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচারের ব্যবস্থা করা বিধেয়। এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক সুধীগণ কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণ ঐ ঐ মত সম্বন্ধে যে প্রকার বিচারাদি করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহারা খণ্ডন ও যাঁহারা পোষণাদি করিয়াছেন) তাহারও সম্যক্ সমালোচনা যাহাতে হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রখিতে হইবে। যাঁহারা প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কেবল সূত্র কিংবা তাহার ভাষ্য অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিলে সকল সময়ে ঐ শাস্ত্রের রহস্য আয়ত্ত করা যায় না। উহাতে রীতিমত প্রবেশ লাভ করিতে হইলে ঐ ঐ মতাবলম্বী পরবর্ত্তী লেখকগণের রচিত প্রকরণ-গ্রন্থ এবং বিচার-গ্রন্থাদি অবশ্য পাঠ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাঙ্কর দর্শন বুঝিতে হইলে মাধবাচার্য্যের প্রকরণ-গ্রন্থাদি, রামানুজ-দর্শন বুঝিতে হইলে বেদান্ত-দেশিকাচার্য্যের গ্রন্থাদি, মাধ্বাচার্য্যের মত বুঝিতে হইলে জয়তীর্থ-স্বামীর গ্রন্থাদি পুনঃপুনঃ পাঠ করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়; নচেৎ ঐ সকল দর্শন বুঝা এক প্রকার অসাধ্য। আমাদের দেশে টোলের পঠন পাঠন প্রণালী, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী হইতে কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইলেও একটী বিষয়ে বড়ই অসম্পূর্ণ। টোলের

প্রাচীন প্রণালীতে Cramming হইবার কোন উপায়ই নাই। টোলে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে গ্রন্থাদি অধ্যাপিত হয়, তাহার সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞান হইতেই পারে না। পল্লব-গ্রাহিতা দোষ টোলের শিক্ষাপ্রণালীর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু টোলের শিক্ষাপ্রণালীতে অন্য এক ভাবের সঙ্কীর্ণতা আছে; তাহা অবশ্য পরিহার্য্য। টোলে বহুদিন ধরিয়া কেবল কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ অধ্যাপিত হয়। কলিকালের মানুষের আয়ুষ্কাল যেমন অল্প, তেমনই বর্ত্তমান কালের লোকের জিজ্ঞাস্য অনন্ত। সুতরাং ইহার জন্য অল্প সময়ে অথচ অধিক পরিমাণে যাহাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া কর্ত্তব্য। টোলের অধ্যাপক-মণ্ডলীর নিকট এই বিষয়ে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রহিল। এবং গভর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এই দিকে দৃষ্টি রাখেন ও টোলের সাহায্য করা ও টোলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইবে, তাঁহাদের কার্য্য পরিচালনার জন্য উপযুক্তভাবে এবিষয়ে অনুশাসনাদি প্রদান করেন। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত মত যাঁহারা শিক্ষা করিয়া ব্যুৎপন্ন হইতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য স্বামী মধুসূদন সরস্বতীকৃত "অদ্বৈত সিদ্ধি" পাঠ করেন কিন্তু উহা পাঠ করার পূর্ব্বে মাধ্ব সম্প্রদায়েয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে "অদ্বৈত-সিদ্ধি" পাঠ করা এক হিসাবে নিষ্ফল। কারণ "অদ্বৈত সিদ্ধির" উদ্দেশ্য হইতেছে "ন্যায়ামৃতের" মত খণ্ডন করা। "অদ্বৈতসিদ্ধি" প্রকাশিত হওয়ার পর মাধ্ব সম্প্রদায় হইতে উহার খণ্ডন গ্রন্থ রচিত হয় তাহার পরেও শঙ্কর-মতাবলম্বীরা উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শুনা যায়, মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, শঙ্কর-মতাবলম্বিগণের ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ মাধ্ব মতের শেষ খণ্ডন শঙ্কর-মতাবলম্বীরা অদ্যাবধি করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহার

মধ্যে সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, এই সকল বিচার গ্রন্থ পাঠ না করিলে উভয় মতের রহস্যোদ্ঘাটন সম্পূর্ণভাবে হয় না। দর্শনশাস্ত্র মনন-প্রধান। সুতরাং দার্শনিক মত লইয়া যত বিচার ও তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, তাহার যতই আলোচনা হইবে, ততই আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করিবার পথ সুগম হইবে। শুনিয়াছি, শঙ্কর মত লইয়া মাধবাচার্য্যের সহিত রামানুজ সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল,—বেদান্ত দেশিকাচার্য্য তাহার মধ্যস্থ ছিলেন। মাধবাচার্য্য নাকি ঐ বিচারে বেদান্ত দেশিকাচার্য্যের মতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার বল্লভ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্কর মতাবলম্বীদের বহু বিচার হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল বিচারের বিষয় বিবিধগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। "শুদ্ধমার্ত্তণ্ড", "প্রাভঞ্জন" প্রভৃতি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। এই সকল প্রণালী পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কি প্রকার সূক্ষ্ম মেধার সহিত অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া নিজ মত দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল বিচারের কথা আমরা এখন বিস্মৃত হইয়াছি। কলেজে পাঠ করিবার সময় আমরা John Stuart Mill কর্ত্তৃক Sir William Hamiltonএর মতগুলি পরীক্ষা করা সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছি। এই প্রকার M' Cosh কর্ত্তৃক John Stuart Millএর মত লইয়া বিচার-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছি। ঐ সকল বিচার-প্রসঙ্গ যদি উচ্চ পরীক্ষার পাঠ্য হইতে পারে, তাহা হইলে আমি ইতিপূর্ব্বে যে যে বিচারের কথা বলিলাম, কিংবা শঙ্করের সহিত মণ্ডন-মিশ্রের বিচারাদি উচ্চ পরীক্ষার পাঠরূপে নির্দ্ধারিত হইবে না কেন? কেনই বা ঐ সকল অদ্ভুত বিচার-কৌশল আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রার্থী যুবকদের অগোচরে থাকিবে? আমি ত ইহার কোন কারণ বুঝি না।

ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবল হিন্দু দর্শন বুঝায় না, বৌদ্ধ-দর্শন এবং জৈন-দর্শনও ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত। বৌদ্ধ-দর্শন এবং জৈন-দর্শনে যেমন হিন্দু-দর্শনের মত খণ্ডনাদি আছে, তেমনই হিন্দু-দর্শনের মধ্যেও ঐ প্রকার বৌদ্ধমত ও জৈনমত খণ্ডন করা হইয়াছে। হিন্দুদর্শন মধ্যে আবার পরস্পরের মত-খণ্ডন দেখা যায়। এই সকল এখনও রীতিমত আলোচিত হয় নাই। এমন কি, অনেক স্থলে এই সকল মতের গ্রন্থগুলি পর্য্যন্ত অদ্যাপি প্রকৃষ্টরূপে অনুসন্ধান করা হয় নাই। এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মূল গ্রন্থ এবং পরস্পরের মধ্যে বিচার গ্রন্থের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহার সামান্য অংশ মাত্রও কোনও এক ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় সংগৃহীত হইবার নহে। এই জন্য সার্ব্বজনীন চেষ্টা হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী হইতে এই সকল গ্রন্থের অনুসন্ধান হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপর এক এক মত সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন ও আলোচনার ভার দিয়া তাঁহাদের দ্বারা ঐ বিষয় পরিস্কৃতরূপে শিক্ষিত সমাজের নিকট উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা না হইলে ঐ সকল মতের প্রকৃত রহস্য শিক্ষিত মানব সমাজের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকটেও অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। এই প্রকারে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রীয় মতগুলি নষ্ট হইতে দেওয়া কি বর্ত্তমান শিক্ষিত ভারতবাসীদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? আমি যে ভাবে প্রস্তাব করিলাম, তদনুসারে যদি ভারতীয় দার্শনিক মতগুলি আলোচিত হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিক মতগুলিরও প্রকৃত-প্রস্তাবে তখন সমালোচনা সম্ভবপর হইবে, নচেৎ বর্ত্তমানের ন্যায় দুই এক খানি মাত্র মৌলিক গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অনুবাদ পাঠ করিয়া তুলনার সমালোচনা করা দূরে থাকুক, ভারতীয় মতগুলি সম্যগ্‌রূপে প্রণিধান করাও অসম্ভব। আসুন, আমরা এই সম্মিলন হইতে এমত কিছু করি, যাহা দ্বারা বঙ্গভাষায়

এই সকল দার্শনিক মতগুলি আলোচনা করিবার পথ সুগম হয়, এবং আমাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে যাঁহারা কেবল মাতৃভাষা জানেন, ইংরাজী কিংবা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহাদের নিকটে ঐ সকল দার্শনিক মতগুলি অজ্ঞাত এবং অনালোচিত না থাকে, ও আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ভাষারই চর্চ্চা করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য দর্শনাদি-শাস্ত্র সকলও যাহাতে তাঁহাদের গোচরে আসিতে পারে। এই প্রকারে বিভিন্ন মতগুলি এক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে পারিলে এবং এতৎসম্বন্ধে সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা আরম্ভ হইলে মতগুলির মধ্যে প্রকৃত দোষগুণ এক প্রকার অবধারিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা-শক্তির প্রসার যেমন বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই উহার গভীরতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; তখন প্রকৃত মননের সার্থকতা ঘটিবে। মানুষ মাত্রেই কেহ সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে, একমাত্র শিবই অভ্রান্ত এবং জীবমাত্রেই ভ্রান্ত। এই কথাটা গ্রীস্‌দেশেও অন্যভাবে প্রচলিত ছিল। তত্রত্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিতেন যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র পরমেশ্বরেরই অধিকৃত। মানুষে কেবল তত্ত্বজ্ঞান ইচ্ছা করিতে ও ভালবাসিতে পারে; তজ্জন্যই ঐ দেশে দর্শন-শাস্ত্রের নাম Philosophy হইয়াছিল। আমাদের মনন কাজেই সম্পূর্ণ তত্ত্বদর্শী হইতে পারে না; সুতরাং অন্যান্য দেশের মনীষীরা কি ভাবে কোন্ তত্ত্বের কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা জানা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য ও অত্যাবশ্যক। এই সকল ব্যাপারের আনুষঙ্গিক অন্য এক প্রকার মহৎ ফলও আছে। বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যে পরস্পরের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারা যতই বিদিত হইবে, ততই ঐ ঐ জাতিদের মধ্যে প্রকৃতভাবে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইবে। প্রকৃত মর্য্যাদা-বোধ ব্যতীত কোন জাতি কিংবা কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। সমস্ত বিজ্ঞানের শিরোমণি-স্বরূপ

দর্শন-শাস্ত্রীয় মত যতই আমরা যে জাতি সম্বন্ধে জানিতে পারিব, ততই সেই জাতির প্রতি আমাদের সম্মান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই। সম্মান-বুদ্ধি বৃদ্ধির সহিত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। দার্শনিক মতাদি জানিলে জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সম্মান-বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক বলিতেছি কেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। দার্শনিক মত মাত্রেই মননের দ্বারা সাধিত হয়; মনন অনুভূতিরই উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করে; সুতরাং অনুভূতি-উপজীব্য কোনও মত বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইতে পারে না। উহা অসম্পূর্ণ হইতে পারে, একদেশ-দর্শী হইতে পারে, কিন্তু এককালে অযথার্থ হইতে পারে না। Herbert Spencer প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন "However wrong many human beliefs appear we may infer that they germinated from actual experiences, and that they originally contained, and perhaps still contain, some small amount of truth. We may assume this more especially of those beliefs which are nearly or quite universal."

এই ভাবে জাগতিক মত-সমূহ আলোচিত এবং পরীক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে, আপাততঃ জ্ঞানে আমাদের যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইলে বুঝা যাইবে, তাহাদের মধ্যে বিরোধী অংশ কিছু কিছু থাকিলেও তাহাদের মধ্যে সাধারণ অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অংশ নিতান্ত অল্প নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক আলোচনা কেবল যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা নহে, ইহা তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তি-বৃন্দের তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভেরও এক প্রকৃষ্ট উপায়। আমি এতক্ষণ

যাহা বলিলাম, তাহাতে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিকদিগের মত-সমূহ একত্র আলোচিত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। ইহা যে কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি তাহা নহে; এই বিষয়টী দেখাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

প্রথমে মনোবিজ্ঞানের বা মনস্তত্ত্বের কথাটাই ধরা যাউক। ভারতীয় দর্শনে কাহারও মতে মন একটী ইন্দ্রিয়, ইহার নাম অন্তঃকরণ; কেহ বা ইহাকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। আবার কাহারও মতে মনকেই আত্মা বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান অনুসারে মনকে প্রায় এই ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এতদতিরিক্ত কথা বড় কেহ বলিতে পারেন নাই। তবে মনের ক্রিয়া এবং মনের ক্রিয়া প্রণালী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। মন আত্মা কি ইন্দ্রিয়, এই বিষয়ে এখানে আমি কিছুই আলোচনা করিব না। ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ আমাদের যাবতীয় অনুভূতির উপকরণ মনের নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তথায় যথাযথ-রূপে ঐ উপকরণ গুলি বিন্যস্ত এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তবে আমাদের জ্ঞান উৎপাদন করে। কোনও বাহ্য বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিলে ঐ সংস্পর্শ-জনিত এক প্রকার উত্তেজনা আমাদের বিশেষ বিশেষ স্নায়ুমধ্যে ঘটিয়া থাকে; তৎপরে ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্ক-গত হইয়া ঐ বাহ্য পদার্থ-সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য উৎপাদন করে। ইহাকেই বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি বলা যায়। যাহাকে আন্তর বিষয় বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে ঐ প্রকার সংস্পর্শাদি ঘটে কি না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না; কিন্তু আমরা যাহাকে আন্তর অনুভবের বিষয় বলি, তাহার উপলব্ধি ঘটিলে আমাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর মধ্যে যে বিকার উপস্থিত হয়, সে

সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, যে কোন প্রকার উপলব্ধিই হউক না কেন—বাহ্যবিষয়েরই হউক কিংবা আন্তর বিষয়েরই হউক—উপলব্ধি হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাদের শরীরে (মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুমধ্যে) একটা উত্তেজনা এবং তজ্জনিত এক প্রকার বিকার ঘটিবেই। ঐ বিকার-সমূহকে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় জনিত জ্ঞানের সহিত একভাবে সমব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন "It being established that psychical movements are connected in a general way with cerebro-spinal system, physiology has shewn more recently that every psychical state is invariably associated with a nervous state, of which reflex action is the most simple type." এই সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ (Herbert হইতে আরম্ভ করিয়া Lotze, Fechner and Wundt প্রভৃতি) Psycho-physics নামক এক নূতন শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা মনোবিজ্ঞানের বা মনস্তত্ত্বের শাখান্তর মাত্র। ঐ মনীষি-গণ আমাদের ত্বাচ-প্রত্যক্ষ, শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ, ঘ্রাণ-প্রত্যক্ষ এবং রাসন-প্রত্যক্ষে স্নায়বীয় অবস্থা সকল পরীক্ষা করিয়া ঐ ঐ প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষজ্ঞানে স্নায়বীয় উত্তেজনার হ্রাস ও বৃদ্ধি পরিমাণ করিয়াছেন, এবং কোন্ প্রত্যক্ষ কত পরিমাণ উত্তেজনা বৃদ্ধি করিলে আমাদের অনুভবের অবস্থা কি দাঁড়ায়, তাহার নিয়ম সঙ্কলন করিয়া তাহার formula পর্য্যন্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সকল অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল এবং তাঁহাদের ঐ সকল সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে প্রায় একপ্রকার অজ্ঞাত। ঐ গুলি কি আমাদের দেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত

নহে? মাতৃ-ভাষায় উক্ত বিষয় সকলের আলোচনা না হইলে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে উহা পরিজ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণ মধ্যে মতভেদ বড় অল্প নহে; প্রত্যক্ষ প্রমাণের গোচরীভূত বিষয় বৌদ্ধমতে একপ্রকার, আর অন্যান্য দার্শনিকগণের মতে অন্য প্রকার; বিশেষতঃ অদ্বৈত বেদান্ত-মতে (অন্ততঃ বেদান্ত-পরিভাষার রচয়িতা যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে) প্রত্যক্ষের লক্ষণ যাহা করা হইয়াছে, তাহার সহিত নৈয়ায়িকগণের কিংবা অন্যান্য দর্শনকারদিগের মতের প্রায়শই ঐক্য নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং ত্বগিন্দ্রিয়,—ইহারা নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে; কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিষয়-দেশে গমন করিয়া তবে বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে; এই মত নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ লইয়া আমাদের দেশে এই যে নানাপ্রকার মতভেদ আছে, ইহার একটী সমন্বয় করার চেষ্টা-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের নবাবিষ্কৃত Psycho-physics নামক শাস্ত্র কোনও সাহায্য করে কিনা, তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য। তার পর প্রত্যক্ষের বিষয় নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কিংবা সবিকল্পক জ্ঞান কিংবা উভয়াত্মক জ্ঞান, এই বিষয়ে বহু বিচার ভারতীয় দর্শনে দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সম্বন্ধে গবেষণা এবং উল্লিখিত Psycho-physics নামক শাস্ত্রের আলোচনা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে অনেকাংশে পরিষ্কৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় কথা অনুমান-প্রমাণ-সম্বন্ধে। ভারতীয় ন্যায় দর্শনে, বিশেষতঃ নব ন্যায় শাস্ত্রে, অনুমান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এবং অনুমানের প্রণালী-ঘটিত বহু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে; পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত উহার তুলনামূলক রীতিমত সমালোচনা অদ্যাপি

হয় নাই। অদ্বৈত বেদান্তীরা নব্য ন্যায়ের প্রাদুর্ভাবের পর নৈয়ায়িকদিগের প্রণালী লইয়া যে ভাবে জগন্মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। "অদ্বৈত সিদ্ধির" মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদী ব্যাস-রামাচার্য্য "তরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন;—তাহার উত্তরে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী "ব্রহ্মানন্দীয়" নামক এক গ্রন্থ লিখেন। তদুত্তরে বনমালী মিশ্র "বনমালিমিশ্রীয়" নামক উত্তর-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, অদ্বৈতবাদীরা ঐ গ্রন্থের খণ্ডন করিতে অদ্যাপি সাহসী হয়েন নাই। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ঐ প্রসঙ্গে "লঘুচন্দ্রিকা", "অদ্বৈত বিজয়-বৈজয়ন্তী" এবং "ন্যায় ভাস্কর" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সকল বিচার সম্যগ্‌-রূপে পর্য্যালোচিত হইলে অনুমানপ্রমাণ-সম্বন্ধে অনেক কথা যে পরিস্কৃত-রূপে বুঝা যাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এক কথা,—ন্যায়দর্শন এবং নব্যন্যায়ের মধ্যে বিষয়গত কিছু পার্থক্য আছে। নব্যন্যায়ে অনুমান-প্রণালী ও তর্ক-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ই প্রধানরূপে আলোচিত হইয়াছে; প্রাচীন ন্যায়-দর্শনে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থের সম্যক্ আলোচনা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, নব্যন্যায়ের বিষয়-সঙ্কোচ বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবে ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক সুপ্রসিদ্ধ দিঙ্‌নাগাচার্য্য-রচিত "প্রমাণ-সমুচ্চয়" গ্রন্থের অভ্যুদয়ের পরে নব্যন্যায়ের সৃষ্টি। এ কথার মধ্যে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা অবশ্য আলোচনার বিষয়। বৌদ্ধদিগের ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানাবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে; উপযুক্ত-ভাবে ঐ গুলির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাদি হইলে নব্য ন্যায়ের সহিত বৌদ্ধ ন্যায়ের কি সম্বন্ধ, তাহা আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। জৈন ন্যায়ের গ্রন্থাবলীও আপাততঃ অনেক মুদ্রিত হইয়াছে; উহারও আলোচনা করা আমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণের

নিতান্ত কর্ত্তব্য। কারণ যখন ভারতবর্ষের দর্শন-শাস্ত্রাদি সজীব ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্ক কাটাকাটি হইত এবং বাদ-বিচারাদিও হইত; সুতরাং ঐ প্রকারে পরস্পরের প্রভাব পরস্পরে সংক্রামিত হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক। উভয়বিধ শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতেও অভিজ্ঞতা জন্মিলে ঐ সকল প্রভাবের প্রসার কত দূর, তাহা বুঝা সহজ হইবে। সমাজ-তত্ত্ব ও দর্শন-শাস্ত্রাদির কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে ঐ ঐ বিষয়ে যাবতীয় মতবাদের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য জানা অল্প উপকারী নহে। কোন্ গ্রন্থ কোন্ সময়ে কি অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় জানার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা এদেশের টোলের অধ্যাপক মহাশয়গণ স্বীকার করেন না; যাঁহারা ঐ প্রকার বিষয় অনুশীলন করেন, তাঁহাদিগকে "মলাটের পণ্ডিত" বলিয়াই উপহাস করেন। এই উপহাসের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য থাকিলেও মতবাদের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য অনুসন্ধান করা একান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে; উহা দ্বারা অনেক প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণের ন্যায় ঐ বিষয়ে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; ঐ সম্বন্ধে আমাদের মনোনিবেশ করা সঙ্গত।

তৃতীয় উদাহরণ অদ্বৈতবাদ-উপলক্ষে আলোচনা করিলেই পাওয়া যাইবে। অদ্বৈতবাদ বলিতে এদেশের দার্শনিকগণ যাহা বুঝেন, তাহার সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেক প্রকার অনৈক্য আছে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই অদ্বৈতবাদ বলিতেই ব্রহ্মই সত্য বস্তু, জগৎ মিথ্যা বস্তু, ইহাই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশেই ঐ অদ্বৈতবাদ মত লইয়া এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার আছে, যাহার অধিকাংশ বিষয় এখনও এই দেশের পণ্ডিতগণের নিকট অপ্রচলিত। যিনি যে

সম্প্রদায়ের লোক, তিনি সেই সম্প্রদায়ের, মত লইয়াই আলোচনা করেন, ঐ সম্প্রদায়-বহির্ভূত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মত লইয়া বিচার করা ততটা আবশ্যক মনে করেন না। বর্ত্তমান কালে ইহা হইলে চলিবে না; ঐ সকল বিচার-গ্রন্থ রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমাদের দেশেই যখন এতটা অনভিজ্ঞতা তখন ঐ মত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে অনভিজ্ঞতা থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? তাঁহাদের এক-জন বলিয়াছেন,- "Pantheism is divided into two modern forms, the occidental and oriental. The former merges the world in God, the latter merges God in the world. In that, God is rest in this, He is motion, there God is being, here He is development, process."

আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে, এই জগতের অস্তিত্বের সহিত ব্রহ্মের অস্তিত্বের কুত্রাপি সমীকরণ করা হয় নাই। এই জগতের মধ্যেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-পর্য্যবসানের কথা আমাদের দেশের কোনও দার্শনিক বলেন নাই। তাঁহারা সকলেই এই জগতের অতিরিক্তরূপে ব্রহ্ম পদার্থকে স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ অবশ্য ব্রহ্ম। ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিংবা ব্রহ্মে জগৎ-নামক মিথ্যা-বস্তু অধ্যস্ত হইয়াছে; যিনি যাহাই বলুন না কেন, ব্রহ্মের জগদতিরিক্ত সত্তা নাই, এ কথা এ দেশে কেহ বলেন না। সুতরাং এই দেশের অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উল্লিখিত মত নিতান্তই অসার বলিতে হইবে। আমাদের দেশে অদ্বৈত-বাদকে কেহ কেহ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেহ কেহ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কেহ বা জাত্যদ্বৈতবাদ, এবং কেহ বা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

ইত্যাদি নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল মতগুলি একত্র সমালোচিত না হইলে কোন্ মতবাদের মূল কতদূর যুক্তি-সহ, তাহার বিচার অসম্ভব; এবং এই সকল বিভিন্ন মত লইয়া যে সঙ্কীর্ণতা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অপনোদিত হইতে পারিবে না। জ্ঞানচর্চ্চায় সঙ্কীর্ণতার ন্যায় অপকারী শত্রু আর দ্বিতীয় নাই; সুতরাং বিচারের জন্য আমাদের সকল মতেরই আলোচনা করা উচিত। পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজী অংশে পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদীদের মত সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সত্য; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ব্রহ্মের জগদতিরিক্ত সত্তার কথা বড় কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রীস-দেশীয় দার্শনিকদের কথা আপাততঃ বিচার না করিয়া বর্ত্তমান যুগে Spinoza হইতে আরম্ভ করিয়া Hegel পর্য্যন্ত ধরিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুদের ন্যায় ব্রহ্মের জগদতিরিক্ত সত্তার প্রতি কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নাই। Spinoza বলেন, "The foundation of all that exists is the one eternal substance which makes its actual appearance in the double world of thought and of matter existing in space." "To my mind God is the immanent (that is the intramundane) and not the transcendent (that is the supra-mundane) Cause of all things; that is, the totality of finite objects is posited in the Essence of God and not in His will." সুতরাং বুঝা গেল যে, Spinoza বলিতেছেন, ব্রহ্মই হইতেছেন একমাত্র বস্তু, যাঁহাতে সমস্ত বিভিন্নতা এবং বিশেষণতা সমন্বিত হইয়াছে। অবশ্য আমি অস্বীকার করি না যে, Spinoza র মত অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদের অন্তর্গত, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। ইহা লইয়া আমাদের বিচার

এখানে অনাবশ্যক। আমি কেবল এই স্থানে ইহাই দেখাইতেছি যে, Spinoza জগৎ এবং ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝিতেন এবং তাহাতে ব্রহ্মের জগদতিরিক্ত সত্তা তিনি বিশেষ-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন কি না? Fichte এর মতে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনুন,—"The non-ego, according to Fichte, is subjective in its origin, and that is where he departs widely from Berkley's theological idealism. Not that I create the not-myself; I assume it as the condition of my self-consciousness—a remarkable feat of logic, but after all not more wonderful than that space and time should result from the activity of the outer and inner senses. This figment of my imagination is any how solid enough to beget a new feeling of resistance and recoil, throwing the self back on itself and bringing with it the interpretation of that external impact by the category of causation, or its own activity as substance and of the whole deal between the ego and non-ego as interaction or reciprocity...... In this way the whole array of Kant's forms, categories and faculties is evolved as a coherent system of Scientific thought in obedience to a single principle—the self-realization of the ego, alternatively admitting and transcending a limit to its activity." Fichteএর এই অহংতত্ত্ব এবং তাঁহার কল্পিত অনহং বস্তু ও অহংতত্ত্বের এই প্রকার

আত্মলাভের প্রসঙ্গ নিতান্ত দুরূহ, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এইমতে God কে এই জগতের একটী Underlying principle মাত্র বলা হইয়াছে।

তার পর Schelling এর মত দেখুন। তাঁহার মতে "Eternal absolute being is continually separating in the double world of mind and nature. It is one and the same life which runs through all nature and empties itself into man. It is one and the same life which moves in the tree and the forest, in the sea and the crystal, which works and creates in the mighty forces and powers of natural life, and which, enclosed in a human body, produces the thoughts of the mind." এই যে জগতের এবং চেতন পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত এক অদ্বিতীয় বস্তু আছে, যাহাকে Schlleing "Absolute" বলিয়াছেন, যাহা চেতন ও জড় এই দুই শ্রেণীতে সর্ব্বদাই পৃথক্‌ভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে বলা যায়, তাহার দ্বারাও ব্রহ্মের জগদতিরিক্ত সত্তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এখন Hegel এই সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাঁহার মতে "The absolute in the universal reason, which having first buried and lost itself in nature recovers itself in man, in the shape of selfconscious mind, in which absolute at the close of its great process, comes again to itself, and comprises itself into unity with itself. This process of mind is God. Man's thought of God is the existence of God.

God has no independent being or existence. He exists only in us. God does not know Himself; it is we who know Him. While man thinks of and knows God, God knows and thinks of Himself and exists. God is the truth of man and man is the reality of God." এখানে Hegel স্পষ্টই বলিতেছেন যে, বুদ্ধির ক্রিয়া-বিশেষই ব্রহ্ম; তাঁহার আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই সকল দার্শনিকগণের মতে দেখা গেল, ব্রহ্মকে "Absolute" কিংবা "Moral order of the world" কিংবা "the world's Eternal Being" ই বলা হউক, কুত্রাপি ব্রহ্মের জগদতিরিক্ত সত্তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

পাশ্চাত্য দেশে অদ্বৈতবাদ আবার প্রকারান্তরে দুই প্রকার। কেহ কেহ সম্যগ্ জড়বাদী; তাঁহাদের মতে এই জগতে জড় হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে; আবার অন্য একদল সম্যক্ চৈতন্যবাদী, অর্থাৎ ইঁহারা চেতন হইতে জড়ের বা জড়াভাসের উৎপত্তি হইয়াছে বলেন। Herbert Spencer এবং Bain প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড় ও চৈতন্যের মধ্যে একটী সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার সহিত Fichte এবং Schelling এর মতের কিছু কিছু সাদৃশ্য কোনও কোনও অংশে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। Herbert Spencer এর মত শুনুন,—"In a long and elaborate argument Mr. Spencer defends Realism, but endeavours to purify it 'from all that does not belong to it' The result is what he calls 'Transfigured Realism'—Realism contenting itself with affirming that the object of cognition is an independent existence. He says,—The Realism we are

committed to is one which simply asserts objective existence as separate from, and independent of, subjective existence. But it affirms neither that any one mode of this objective existence is in reality that which it seems, nor that the connections among its modes are objectively what they seem. Thus it stands widely distinguished from crude Realism ; and to mark the distinction it may properly be called Transfigured Realism."

Bain বলেন—"The Arguments for the two substances have, we believe, now entirely lost their validity ; they are no longer compatible with ascertained science and clear thinking. The one substance, with two sets of properties, two sides, the physical and the mental—a *double-faced* unity—would appear to comply with all the exigencies of the case we are to deal with this, as in the language of the Athanasian Creed not confounding the persons nor dividing the substance. The mind is destined to be a double study—to conjoin the mental philosopher with the physical philosopher.—"

এতদ্বারা দেখা গেল যে, Herbert Spencer তাঁহার কল্পিত "Transfigured Realism" এবং Bain তাঁহার কল্পিত *"double-faced* unity," এই দুই মতবাদ দ্বারা ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইয়া জড় ও

চৈতন্য এতদুভয়ের নিষ্পাদক এমন এক পদার্থের কল্পনা করিয়াছেন, যাহার বিভিন্ন অভিব্যক্তির ধারা হইতে এই সংসারে যাবতীয় জড় ও চৈতন্য পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল মতের সমালোচনা এখানে করিব না। আমার উদ্দেশ্য, এখানে কেবল এই সকল মতবাদ যাহাতে এই দেশীয় অদ্বৈত-সম্বন্ধীয় মতবাদগুলির সহিত একত্র আলোচিত হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তা দেখান। আমার বিশ্বাস, ব্রহ্ম-পদার্থের এই ভাবে নানা প্রকারে নানাবিধ বিকারের কথা শুনিবামাত্র আমাদের দেশের অদ্বৈত-মতাবলম্বীরা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন; কিংবা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। অদ্বৈতবাদের এই সকল ধারার কথা সুন্দররূপে Sir William Hamilton শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। আমি এখানে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"The philosophical Unitarians or Monists reject the testimony of consciousness to the ultimate duality of the subject and object in perception, but they arrive at the unity of these in different ways. Some admit the testimony of consciousness to the equipoise of the mental and material phenomena, and do not attempt to reduce either mind to matter or matter to mind. They reject, however, the evidence of consciousness to their antithesis in existence, and maintain that mind and matter are only phenomenal modifications of the same common substance. This is the doctrine of absolute Identity,—a doctrine of which the most illustrious representatives among recent

philosophers are Schelling, Hegel and Cousin. Others again deny the evidence of consciousness to the subject and object as co-original elements; and as the balance is inclined in favour of the one relative or the other, two opposite schemes of psychology are determined. If the subject be taken as the original and genetic, and the object evolved from it as its product, the theory of Idealism is established. On the other hand, if the object be assumed as the original and genetic, and the subject evolved from it as its product, the theory of Materialism is established." এই সকল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে এ দেশের অদ্বৈত মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের যে অশেষ প্রকারে উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পাশ্চাত্যদিগের অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের মতের সৌসাদৃশ্য তাঁহারা অনেক স্থলে দেখিবেন, এবং কোন কোন স্থলে মৌলিক বিরোধও দেখিতে পাইবেন। উক্ত উভয় প্রকার মতই আমাদের দেশীয় অদ্বৈত-বেদান্তি-কর্ত্তৃক আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ দেশের "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই প্রকার মতের প্রতিধ্বনি পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিম্নলিখিত উক্তিতে তাঁহারা দেখিবেন:—"The Deity Himself becomes identified with the worshipper." "He who knows that Deity is the Deity itself." পরিশেষে যখন Spinoza বলিতেছেন "God loves Himself with an infinite intellectual love," তখন তাঁহারা দেখিবেন যে, উক্ত উক্তিতে বৈষ্ণবদের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রণয়কাহিনী এইখানে

বীজরূপে নিহিত আছে। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে কোন ভেদ নাই; সুতরাং চরম অবস্থায় উপাসনার অবকাশই নাই। অথচ উহাঁদেরই একজন অর্থাৎ শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতী "ভক্তি-রসায়ন" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া কি অপূর্ব্ব-কৌশলে অদ্বৈতমতের সহিত ভক্তির সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচনার যোগ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে উহার বিচার-কৌশল প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। পাশ্চাত্য-দেশের নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এদেশে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে নীতিশাস্ত্রের যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহাও আমাদের দেশে ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনার সময় উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ দার্শনিকাগ্রণী Kant কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিয়ামকরূপে "Categorical imperative" নামক যে মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের দেশীয় নিষ্কাম-কর্ম্ম-পদ্ধতির মত একত্র সমালোচিত হওয়া বিধেয়। এই ভাবে যদি ভিন্ন দেশীয় মত গুলি আমাদের দেশের মত গুলির সহিত একত্র আলোচিত হয়, তাহা হইলে উভয় দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাফলোপদায়ক হইবে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে সকল নূতন আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মেধাবী James কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত Pragmatism এবং অধ্যাপক Henri Bergson কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত মত বিশেষ ভাবে আমাদের প্রণিধানের যোগ্য। Pragmatism বলিয়া James যে মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশের দার্শনিকদিগের জানিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও তাঁহার বিচার-প্রণালী এবং তাঁহার

পূর্ব্বে যে সকল মতবাদ ছিল, তিনি তাহার যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, সেইগুলি আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়। যাঁহারা ঐ মত আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, James মীমাংসকদিগের ন্যায় ন্যায় "স্বতঃ-প্রামাণ্য-বাদী" নহেন; তিনি নৈয়ায়িকদিগের মত "পরতঃ-প্রামাণ্য-বাদী"। তিনি প্রমাণ সম্বন্ধে বিচার করিয়া "truth-claim and validated truth" প্রসঙ্গে যে সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন নহে। প্রকৃত সত্য-পরীক্ষার জন্য তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার আভাস এ দেশে নৈয়ায়িকেরা "প্রবৃত্তি-সামর্থ্য" প্রভৃতি বলিলে কতকটা অনুধাবন করিতে পারিবেন। সুতরাং এই সকল আলোচনা এ দেশের দার্শনিকদিগের মধ্যে অত্যন্ত উপাদেয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। অধ্যাপক Henri Bergson যে ভাবে intuition এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মত এ দেশে পরিজ্ঞাত হইলে তাঁহাকে আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণ বিশেষ সমাদর করিবেন, তাহা বলা চলে। প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে তিনি intelligence (বুদ্ধি) এবং analysis (বিশ্লেষণ-বিচার) প্রভৃতির হেয়তা প্রতিপাদন করিয়া intuition (বোধি) এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। Metaphysics এর উপর পাশ্চাত্য দেশে যে আক্রমণ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, Bergson পুনরায় সেই Metaphysics কে সম্মানের আসন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিচার-প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দিতেছি। কোন ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা-লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, সেই ব্যক্তির সহিত পূর্ণভাবে একত্ব-স্থাপন ("coincidence with the person himself") ব্যতীত যেমন তাহার চরিত্র-বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না, তেমনই কোন বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে

হইলেও তদ্রূপ করা আবশ্যক। Bergson সম্বন্ধে একজন গ্রন্থকার বলেন, "Study him, turn him round and round, ask him questions at your leisure, place him before you......... Every feature will appear in its turn and take the place of the man himself in this expression. Transfer this page from the literary to the metaphysical order and you have intuition, as defined by Bergson." উঁহার মতে intuition এক প্রকার জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সর্ব্ব প্রকারে এক হইয়া তাহার ভিতর আপনাকে স্থিত করা। পক্ষান্তরে Analysis হইতেছে —বস্তুর উপাদানগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অন্য জ্ঞাত বিষয়ের তুলনায় তাহার তথ্য সংগ্রহ করা। পূর্ব্বে দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে, Bergson বলেন, কোনও নায়কের চরিত্র-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার চলন, বলন, ভাব, ভঙ্গী প্রভৃতি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে এক প্রকার জানা হয়; কিন্তু ঐ জানা উক্ত নায়কের চরিত্র-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা সম্পূর্ণ জ্ঞান নহে। যদি কোন প্রকারে ঐ নায়কের স্বরূপ আমাদিগকে বোধ করিয়া ঠিক তাহার ন্যায় হওয়ার বিষয় কল্পনাতে আনিতে পারি, তাহা হইলে ঠিক তাহার সহিত আমাদের মানসিক একত্ব-লাভ ঘটে। তিনি ইহাকে "intellectual sympathy" কিংবা "coincidence with the person himself" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ঠিক এই ভাবে না হইলেও আমাদের দেশে কোন বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাও কতকটা এই প্রণালী-মূলক। এই সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মতবাদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক বিষয়ে আমাদের দেশের পূর্ব্বতন দার্শনিকগণ যে ভাবে বুঝেন, তাহার সহিত ঐ সবগুলির ঐক্য বা পার্থক্য কোথায় এবং কি কারণ-মূলক। এই প্রকারে

পরস্পরের মত বুঝাবুঝি হইলে পরস্পরের অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ হইবে ও পরস্পরের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অপার আনন্দ লাভও ঘটিবে।

এখন দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ও সার্থকতা কি, এতৎ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার এই বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ পদার্থ ও তগদত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান কিংবা ঐ ঐ জ্ঞান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পরম্পরা ইত্যাদি বিষয় দর্শনশাস্ত্রের ঠিক প্রতিপাদ্য নহে। আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে লইয়া যে যে মৌলিক প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থাপিত হয়, তাহার বিচার এবং তৎসম্বন্ধে উপপত্তি-মূলক সিদ্ধান্তগুলি যে শাস্ত্রের বিষয়ীভূত, তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে। "আমি কি," "কোথা হইতে আসিয়াছি," "কোথায় কি ভাবে আমার পরিণতি," "চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতেছি, ইহার মূল কি?" এবং "ইহাদের সহিতই বা আমার সম্বন্ধ কি প্রকার"—এতজ্জাতীয় প্রশ্ন-পরম্পরার সমাধান করিতে না পারিলে মননশীল মানবের মানসিক শান্তি কিছুতেই হইতে পারে না। এই প্রশ্নগুলির সমাধান যে ভাবে যে জাতি করিয়াছে, তাহার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের উপর সেই জাতির মানসিক উন্নতির সার্থকতা নির্ভর করে। ঐ সকল মৌলিক প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ মূল তিনটী বিষয়ের প্রশ্নাকারে উহাদের পর্য্যবসান করিয়াছেন। জড়, চেতন এবং পরমেশ্বর এই তিন বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে উক্ত প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় আকাজ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। আমি আছি এবং আমার ন্যায় চেতনা-বিশিষ্ট অন্য প্রাণীও আছে। এতদ্ব্যতীত জড় নামক আর এক জাতীয় বস্তু, আমি ও আমার ন্যায় চেতন প্রাণী হইতে স্বতন্ত্রভাবে আছে। এই উভয় বিষয় লইয়া কার্য্যতঃ কোন মতভেদ নাই।

পরমেশ্বর-সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও এই দৃশ্যমান চেতন ও জড়ের উৎপত্তির নিদান-স্বরূপ অবশ্য কোন বস্তু যে আছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। আমি কিংবা আমার ন্যায় কোন চেতন প্রাণী, যখন ইচ্ছামত কোন চেতন প্রাণী কিংবা কোন প্রকার জড় বস্তু সৃষ্টি করিতে পারি না, বা পারে না, তখন চেতন ও জড় পদার্থের স্রষ্টা, দৃশ্যমান প্রাণী কিংবা জড় হইতে যে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, তাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না। জড় হইতে চেতন-উৎপত্তির কোন প্রমাণ কেহ অদ্যাপি করিতে পারেন নাই। Herbert Spencer প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে এক মৌলিক বস্তু বা শক্তি হইতে সমান্তরাল-ভাবে দুই পৃথগ্ জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ চেতন ও জড়ের উৎপত্তি ব্যখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আদৌ বিচার-সহ নহে। সুতরাং চেতন ও জড়ের স্রষ্টা কি প্রকার বস্তু, এবং তাঁহার সহিত চেতন প্রাণীদের এবং জড়ের সম্বন্ধ কি প্রকার, ইহা অবশ্য বিচারের বিষয়। আমি আছি, ইহার বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এতৎ-সম্বন্ধে কোন প্রমাণেরও আবশ্যকতা নাই। দৃশ্যমান জড় বস্তুও আছে; আচার্য্য শঙ্কর "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখায় এই মত দৃঢ় করিয়াছেন। চেতন ও জড়ের সৃষ্টি-সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। আমি এখানে জড়বাদী-দিগের সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচনা করিব না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড় হইতে চেতনের কিংবা নূতন কোন জড়ের উৎপত্তি, এবং আমি বা আমার ন্যায় চেতন প্রাণী হইতে কোন প্রকার চেতন প্রাণী বা কোন প্রকার জড়ের উৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক, ইহা যে সম্ভবপর, তাহাও অদ্যাদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং জড় ও চেতন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ এতদুভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী কোন বস্তুকেই আমরা, আমাদের

ও জড়ের স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। এই সৃষ্টি লইয়াও নানা-প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি ঐ মতগুলিকে এই স্থানে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিব:—

১। শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি। এই মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট পদার্থের উপাদান গুলি পর্য্যন্তেরও অভাব ছিল, বলা হয়। সহসা কোন সর্ব্বশক্তিশালী পুরুষের আজ্ঞা বা ইচ্ছা ক্রমে সমস্ত উপাদান-সংবলিত জাগতিক পদার্থ-সমূহের উৎপত্তি হইল। বলা বাহুল্য যে, এই মত আর্য্যজাতির চিন্তাপ্রণালীর একান্ত বিরুদ্ধ। এই মত সাধারণ-ভাবে Semitic জাতি-সমূহের মধ্যে প্রধানরূপে প্রচলিত; আর্য্য জাতিরা এই মতকে আদৌ শ্রদ্ধা করেন না।

২। সৎ হইতে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি। এই মতের মধ্যেও নানা-প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে। কিন্তু এই মতের সাধারণ কথা এইটুকু। এই মতাবলম্বীরা বলেন যে, এক পরম পদার্থ হইতে এই জড় ও চেতনা-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অবান্তরভেদ এই যে, কেহ কেহ বলেন, ঐ পরম পদার্থ স্বয়ং পরিণত হওয়াতে জগতের বিকাশ হইয়াছে; কেহ কেহ বলেন, ঐ পরম পদার্থ স্বয়ং অপরিণত অবস্থায় থাকিয়া অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি বলে এই মিথ্যা অথচ তাহাতে অধ্যস্ত জগতের আশ্রয় হয়েন; অন্যেরা বলেন ঐ পরম পদার্থ অদৃষ্ট কারণের সহায়তায় নিত্য কোন উপাদান-রাশির সংহনন করিয়া এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি করিয়াছেন। যথাক্রমে এই অবান্তর মত গুলিকে নিম্নলিখিত আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। (ক) পরিণাম-বাদ, (খ) বিবর্ত্ত-বাদ, (গ) আরম্ভ-বাদ। এস্থলে পরিণাম-বাদ-রূপে ব্যাখ্যাত মতের আর একপ্রকার স্বরূপ আছে, তাহা যথাস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

এক্ষণে অতি সংক্ষেপে এই ভিন্ন ভিন্ন মত সমূহের কিছু আলোচনা করিতেছি।

প্রথম শ্রেণীর মত লইয়া অধিক বিস্তার করার আবশ্যকতা নাই। কারণ এই মতের স্বপক্ষে অধিক যুক্তি দেখা যায় না। পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যখন এই সৃষ্টি, তখন পরমেশ্বরের ইচ্ছা ঘটিবার কি কোন নির্দ্দিষ্ট কাল আছে? যদি থাকে বলা যায়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে তাঁহার ঐ ইচ্ছা ছিল না কেন? আর কেনই বা সহসা তাঁহার মনে ঐ ইচ্ছার উদয় হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। তবে এতৎ-সম্বন্ধে আমি দুই একটী কথা মাত্র বলিতে চাহি। আমাদের দেশেও যে এই মত সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত, তাহা বলা চলে না। শৈব মতের যে সকল গ্রন্থ কাশ্মীর-দেশে সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ঐ মতের আচার্য্যগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র বিনা উপাদানে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করেন। এমন কি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্ত যাহাকে নাসদীয় সূক্ত বলা হয়, তাহার প্রথমাংশ পাঠ করিলে প্রথম শ্রেণীর মতের কতকটা আভাস যে পাওয়া যায় না, এমত বলা যায় না। ভারতবর্ষ এমনই একটী দেশ যে, সে দেশের দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে সকল প্রকার মতের কিছু না, কিছু পাওয়া যাইবেই। কিছু দিন পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক Dr. Alexander Duff ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মতের প্রসঙ্গে আমি আরম্ভ-বাদ-সম্বন্ধেই সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিব। এই মতের সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, জগতের উপাদান-গুলি নিত্য; পরমেশ্বর অদৃষ্ট-নামক কারণের সহযোগিতায় এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি-করিয়াছেন। জগতে জড়বস্তুর উপাদান হইতেছে পরমাণু

এবং আকাশ। এতদ্ব্যতীত জীবাত্মা নামক চেতন বস্তু আছে, তাহা সংখ্যায় বহু। জড়বস্তুর উপাদানগুলি সংহত করিবার ক্ষমতা সর্ব্বশক্তিশালী পরমেশ্বরেরই আছে। তিনি অদৃষ্ট-নামক সহকারী কারণের দ্বারা উহাদিগকে সংহনন করেন, এবং তাহা হইতে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিকাশ ঘটিয়াছে। জীবাত্মাও তদ্রূপ স্বকীয় কর্ম্মবশে অদৃষ্টবশতঃ নানা প্রকার দেহ ধারণপূর্ব্বক প্রাণি-জগতের বৈচিত্র্যতা সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ মত স্থাপন ও প্রতিপক্ষের মত নিরাস উপলক্ষে যে সকল তর্ক-বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় আছে। সুতরাং সেগুলি আলোচনা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের প্রতি আমার একটা বক্তব্য আছে। পরমেশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ যদি বলা যায়, তাহা হইলে এই মতানুসারে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন সঙ্কোচ করা হয় কি না, ইহা বিশেষভাবে বিচার্য্য। পরমেশ্বর ব্যতীত এবং তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পৃথক্ অথচ নিত্য বস্তুর—পরমাণু, আকাশ এবং জীবাত্মার—অস্তিত্ব স্বীকার যদি করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের সংহননাদি ঐ প্রকার কোন নিত্য শক্তির দ্বারা সমুদ্ভূত হইতে পারিবে না কেন? ঐ ভাবে বিচার করিলে ক্রমে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বা ক্রমাভিব্যক্তিবাদ আসিয়া পড়া কি সম্ভাবনা নহে? আর তাহা হইলে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারের বড় একটা আবশ্যকতা কি থাকে? Herbert Spencer বলিয়াছেন যে, যদি তিনি Gravitation এবং শক্তি (force) সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে জগৎ সৃষ্টি করা অসম্ভব হইত না। তিনি বলিয়াছেন যে, এক অজ্ঞেয় শক্তি এবং তাহার মাধ্যাকর্ষণ নামক ব্যাপার হইতে সমস্ত জীব-জগৎ

ও জড়-জগৎ এবং জীব-জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদির (institutions) উৎপত্তি হইয়াছে। পরমেশ্বর মানার পর যদি তদিতর অথচ তাঁহার ন্যায় নিত্য পদার্থ বলিয়া আকাশ, পরমাণু এবং জীবাত্মাকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পমমেশ্বরের অস্তিত্বকে ক্রমে ক্রমে ঐ যুক্তিবলে লোপ করার পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই প্রকার মতাবলম্বীদিগকে সহজে বলিতে পারেন যে, আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি পদার্থ যদি পরমেশ্বরের নিরপেক্ষতায় থাকিতে পারে, তবে তাহাদের সংহননের জন্য পরমেশ্বর বলিয়া এক সর্ব্বশক্তিশালী বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা গৌরব মাত্র; সুতরাং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা নিস্প্রয়োজন। আমাদের দেশের বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িকগণ যাহাতে এই দিক্‌টা ভাল করিয়া অনুধাবন করেন, আমি তাঁহাদের সেই বিষয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

তাহার পর প্রচলিত পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তাহা এখানে প্রকাশ করিব। এক পরম পদার্থ হইতে, ক্রমাভিব্যক্তি রূপে হউক, কিংবা ঐ পরম পদার্থ নিজে পরিণত হইয়াই হউক, এই জড় ও চেতনাবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই পরিণামবাদের স্থূল অর্থ। এই পরিণাম-বাদকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—১ম, Herbert Spencer প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ যে এক মৌলিক বস্তু হইতে জড় ও চেতনাত্মক বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হওয়ার কথা বলেন, এবং যাহাকে অধ্যাপক Bain প্রভৃতি *"double-faced unity"* বলিয়াছেন, তাহার পরিণাম একজাতীয়। ইহাকে দ্বিভাবনিষ্ঠ একমূল বস্তু বা শক্তির পরিণাম বলা যাইতে পারে। ২য়, সাংখ্যের পরিণাম-বাদ। এই মতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই নিত্য বস্তু। পুরুষ বহু, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অথচ ফলভোক্তা। আর প্রকৃতি এক এবং জড়-

স্বভাবাপন্ন। চেতন পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতির পরিণাম ঘটে, এবং তাহা হইতেই মহদাদিক্রমে জগতের বিকাশ এবং এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় বস্তন্তরের সন্নিধান প্রযুক্ত বস্তন্তরের পরিণাম ঘটিতেছে, ইহাকে এক বস্তুর সান্নিধ্য বশতঃ বস্ত্বন্তরের পরিণাম বলা চলে। ৩য়, ব্রহ্ম নিজেই পরিণত হইয়া এই জগদ্রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছেন। এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বস্তু এবং তাহা সমস্তই ব্রহ্মের পরিণতি। ইহাকে ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদ বলে। এই তিন প্রকার পরিণাম-বাদের ভেদ-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। ইহার মধ্যে প্রথম দুই মত একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উহারা বিচার-সহ নহে। জড় এবং চেতন সম্পূর্ণ পৃথগ্ জাতীয় বস্তু, ইহাদের এক হইতে অন্যের উৎপত্তিও অসম্ভব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আর সাংখ্যের পরিণাম-বাদ-সম্বন্ধে যে সকল তর্ক উঠিতে পারে, তাহার উত্তর দেওয়া বা সমাধান করা সহজ বলিয়া বোধ হয় না। পুরুষ চেতন ও বহু, ইহা সাংখ্যেরা স্বীকার করেন, এবং চেতনের সন্নিধান ব্যতীত জড় প্রকৃতির পরিণাম ঘটিতে পারে না, ইহাও তাঁহারা মানেন। এখন কথা হইতেছে যে, বহু চেতন পুরুষের মধ্যে কোন্ চেতন পুরুষের সন্নিধানে এই জগতের উৎপত্তি হইবে, এই এই বিষয়ে নিয়ামক কি? এবং যখন এক চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয়, তখন ঐ চেতন পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য চেতন পুরুষের সহিত জড় প্রকৃতির সান্নিধ্য ঘটে না কেন? এবং অন্য চেতন পুরুষগুলির অবস্থা তখন কি ঘটে? ইত্যাদি বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাওয়া ভার। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, উক্ত প্রশ্নাবলীর কোন উত্তর সাংখ্যেরা দেন নাই—আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের ঐ সম্বন্ধীয় উত্তর আলোচনা করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় না। পরিণাম-

বাদের তৃতীয় ভেদ সম্বন্ধেও নানা তর্ক আছে। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পরিণাম কিরূপে ঘটে? আত্মবশে তাঁহার পরিণাম ঘটে, না অন্য কোন স্বজাতীয় বা বিজাতীয় শক্তিবশে তাঁহার পরিণাম ঘটে? ব্রহ্মকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব্বত্র নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাঁহার বিকার কি প্রকার? পক্ষান্তরে, তিনি পরিণামী বা বিকারী হইলে, তাঁহার সমস্তটাই কি বিকার প্রাপ্ত হয়, না তাঁহার কোন অংশবিশেষের বিকার হয়? ব্রহ্মের কি কোন অংশ আছে?—এবম্প্রকারের নানাবিধ পূর্ব্ব-পক্ষীয় প্রশ্ন উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। এই মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীবল্লভ অদ্বৈতবাদের অসম্পূর্ণতাপ্রদর্শন উপলক্ষে বলিয়াছেন, যে, আচার্য্য শঙ্কর "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের প্রতি যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের প্রতি তাদৃশ মনঃসংযোগ করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে তিনি কেবল জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ স্থাপন করিতে প্রয়াসী না হইয়া, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহাকে সচরাচর জড় বলা হয়, তাহার সহিতও ব্রহ্মের অভেদ স্থাপন করিতেন। এই সকল কথার উপন্যাস করিয়া তিনি আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদের অসম্পূর্ণতা খ্যাপন করিয়া স্বীয় মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিতে চাহেন। যাহা হউক, ব্রহ্মের পরিণাম কথাটী আপাততঃ শুনিতেই কিছু আত্ম-বিরোধী (self-contradictory) বলিয়া বোধ হয়। যে ব্রহ্ম বস্তুকে নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়, তাঁহার বিকার বা পরিণাম কল্পনা করা কিংবা "অখণ্ডসচ্চিদানন্দৈকরস" ব্রহ্মের বহুতর অংশ কল্পনা করা, উভয়ই শাস্ত্র এবং যুক্তি বিরুদ্ধ। কিন্তু এই সকল আত্মবিরোধী কথার স্থাপন-উপলক্ষে শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কি প্রকার যুক্তি-কৌশল

দেখাইয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দর্শন-শাস্ত্র মনন-প্রধান; অতএব শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বীদের বিচার-প্রণালীতে আমাদের শিখিবার অনেক বিষয় আছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে আমাদের গ্রহণীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি আমাদের নিকট উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। এই মতের আলোচনায় আর অধিক কথা বলার কিছু আবশ্যকতা দেখা যায় না। পরিণাম-বাদের আর এক স্বরূপ আছে। বিবর্ত্ত-বাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বিবর্ত্ত-বাদ বিষয়ে বিচার করিতে সাহসী হওয়া কিছু দুরূহ। কারণ, ঐ মতবাদ এখন ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতেছে। আচার্য্য শঙ্কর হইতে উহার প্রতিপত্তি এদেশে বিশেষভাবে হইয়াছে। বৌদ্ধদের ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্য-বাদ খণ্ডন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈত-বাদ প্রচার করার পর হইতে হিন্দুদের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, অদ্বৈত-বাদই একমাত্র সত্য; এই জন্যই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের দার্শনিক রাজ্যে অদ্বৈত-মত এখন বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈত-মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যাত মায়াবাদ কোন কোন পুরাণ এবং তদনুসারে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালেও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত না কি আচার্য্য শঙ্করকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং কহেন যে, আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধমত নিরাস করেন নাই তিনি জৈন বা আর্হৎ মতই নিরাস করিয়াছিলেন। তাহার মতের সহিত বৌদ্ধ দর্শন এবং বৌদ্ধ মতের কোন বিরোধ নাই। হিন্দুদের বিশ্বাস, আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ মত নিরাস করিয়া ঐ মত-কবলিত বৈদিক মতের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা আচার্য্য শঙ্করকে

তাঁহাদের মতের পরিপোষ্টা বলিয়াই মনে করেন। অদ্বৈত-বাদের খণ্ডন আমাদের দেশে নৈয়ায়িকেরা এবং বেদান্তের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষভাবে করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি অদ্বৈত-মত এখনও প্রবল ভাবে ভারতীয় দর্শন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অদ্বৈত-মতের অভ্যন্তরে এমন সনাতন সত্য নিহিত আছে, যাহার অপলাপ কেহই করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে :—

"বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

অদ্বৈত-মতের খণ্ডন মাধ্বাচার্য্য করিয়াছেন, শ্রীরামানুজাচার্য্য করিয়াছেন, গৌড়ীয় গোস্বামিগণ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্বৈত-মতের মধ্যে যাহা সার সত্য তাহা প্রায় কেহই অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম বস্তু যে শ্রেণীর, সেই শ্রেণীর দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারাও ফলিতার্থে ব্রহ্মেতর বস্তুগুলিরও ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা মানেন না; তবে কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিত, কেহ বা জড় ও চেতন পদার্থগুলিকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা শরীর স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মেতর বস্তু বলিয়া যাহা আমাদের আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তাহার সত্তা কোন না কোন প্রকারে ব্রহ্মের অস্তিত্ব সাপেক্ষ, ইহা সকলেই বলেন। অতএব বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে ব্রহ্মই প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র, অন্য-নিরেপক্ষ সত্তাবান্ বস্তু; অন্য যাহা কিছু আছে, তাহা তাঁহারই অবলম্বনে আছে, তাঁহাকে বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। এ ভাবের অদ্বৈত-মতে কাহারও কোন আপত্তির বিষয় নাই; কিন্তু বিবর্ত্ত-বাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। উহাতে বলা হইয়াছে সৎ এবং অসৎ এই দুইটী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না এমন

সত্তাবিশিষ্ট মায়া নামক এক পদার্থ আছে যাহার শক্তিতে এই মিথ্যা জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়াছে এবং আমাদের এই মায়া-বদ্ধ অবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে। এইখানে জ্ঞাতা যে অহং পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্মা, তাহারও অনুভূতি পূর্ব্বোক্ত মায়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটিতেছে। এখানে বলা হইয়াছে যে মায়া-বস্তু, সৎ এবং অসৎ এই দুই হইতে পৃথক্। সৎ এবং অসৎ হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে "law of excluded middle" বলিয়াছেন, তদনুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ইহাদের মধ্যে আর কোন প্রকার সত্তা থাকিতে পারে না; কারণ, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভাব স্বরূপ, অর্থাৎ সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব; সুতরাং এতদতিরিক্ত কোন সত্ত্বার অবকাশ নাই। ইহা কল্পনা করিলে ব্যাঘাত-দোষ হয়। অদ্বৈত-সিদ্ধিতে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া মধুসূদন সরস্বতী ইহার বিচার করিয়াছেন। "সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ একাভাবে অপরসত্ত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতঃ"—এ যুক্তি তিনি অমান্য করেন নাই; তবে তিনি সত্ত্ব বলিতে যে প্রকার সৎ বুঝেন, অসত্ত্বের অন্তর্গত সৎ পদার্থের ঠিক সেই অর্থ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে প্রথম সৎ শব্দের অর্থ ত্রিকালাবাধ্য সৎ অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে যে সতের বাধ নাই, সেই প্রকার সৎ; কিন্তু দ্বিতীয় অসৎ শব্দের মধ্যে নিবিষ্ট সৎ শব্দের অর্থ হইতেছে, ত্রিকালাবাধ্যরূপ সতের অভাব নহে, কেবল কোন কালে কোন ধর্ম্মীতে সৎ বলিয়া প্রতীয়মানত্বরূপ সতেরই অভাব মাত্র। ইহা হইলে সৎ এবং অসৎ ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভাব স্বরূপ হইল না। আমি কিন্তু এই যুক্তিগুলি বুঝিতে পারি না। একই প্রসঙ্গে একই প্রকার পদার্থ বুঝাইতে গিয়া এক শ্রেণীকে সৎ

বস্তু বলিতেছি, এবং আর এক শ্রেণীকে সৎ বস্তুর অভাব বলিতেছি। এমন অবস্থায় উভয় স্থলে সৎ শব্দ বিভিন্নার্থক বলিয়া কল্পনা করা, যুক্তি-শাস্ত্রের নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। "বিরুদ্ধয়োর্ন প্রকারান্তরতাস্থিতিঃ," এই ন্যায়সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। সুতরাং বিবর্ত্ত-বাদ স্থাপন উদ্দেশ্যে মায়ার যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না।

মায়া-বাদ স্থাপন উদ্দেশ্যে মায়াবী এবং ঐন্দ্রজালিকের ধর্ম্মও ব্রহ্মে আরোপ করা হইতেছে। এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের অদ্বৈত মতাবলম্বীদের প্রণিধান করা উচিত। ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক Descartes জীব এবং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব যে ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সুতরাং তাহা লইয়া এখানে লিপিবাহুল্য করা অনাবশ্যক; তবে তিনি জড় জগতের বাস্তবিক অস্তিত্বের প্রমাণ করা উপলক্ষে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কিছু বিবৃতি করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এই প্রকারঃ—"He has a clear and distinct idea of his own body and of other bodies surrounding it on all sides as extended substances communicating movements to one another. And he has tendency to accept whatever is clearly and distinctly conceived by him as true. But to suppose that God created that tendency with the intention of deceiving him would argue a want of veracity in the divine nature incompatible with its perfection." এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মায়া-বাদ অনুসারে

জগন্মিথ্যা কল্পনা করাতে পরমেশ্বরের নিন্দা করা হয় কি না, তাহা অদ্বৈতীদের বিচার্য্য।

তারপর, বিচার করিতে হইবে, জীবের শরীরাদির উৎপত্তি কি প্রকারে ঘটিল? কর্ম্মমাত্রই শরীরাদি বিভাগ সাপেক্ষ, এবং শরীরাদি কর্ম্মসাপেক্ষ; সুতরাং কর্ম্মজন্য শরীর স্বীকার করিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়, অর্থাৎ কর্ম্মজন্য শরীর কিংবা শরীরজন্য কর্ম্ম, এই বিপ্রতি-পত্তিতে শরীরাদির সৃষ্টিসম্বন্ধে সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী। এখানে প্রায় সকল দার্শনিকই বীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিক দৃষ্টান্তের বলে অনাদিত্ব সিদ্ধ করিয়া ইতরেতরাশ্রয় এবং অনবস্থাদি দোষের নিরাস করিয়াছেন। আমি এখানে বলিতে চাহি যে, ঐ দৃষ্টান্ত দেখাইলে বা অনাদিত্ব বলিলে দোষের সম্যক্ পরিহার করা যায় না। এখানে অনাদি কালের ভিন্ন অর্থ করিতে পারিলে দোষের এক প্রকার সমাধান হইতে পারে। কাল এবং সময় বলিতে আমরা যে প্রকার খণ্ড কালের সমষ্টি বলিয়া বুঝি, ব্রহ্মের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে, উহা না বুঝিয়া এমন অনুমান করিতে হইবে যে, আমাদের কাছে সময় ঐ প্রকার খণ্ড কালের সমষ্টি হইলেও ব্রহ্মের নিকট সময় এই জাতীয় কাল নহে। ব্রহ্ম চিরকাল আছেন, ছিলেন এবং থাকিবেন; এই প্রকার বলিলে আমাদের ব্যবহৃত কাল বুঝায় না এই জাতীর কাল কল্পনা করিয়াই আমরা ব্রহ্মের স্বাভাবিক সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য খণ্ড কালের সমষ্টিরূপ সময়ের গণ্ডিতে আনিতে চাহি। তিনি কালে নাই, কাল তাঁহাতেই অবস্থিত। আমাদের ব্যবহৃত উপাধি আমাদের মন হইতে অপসারিত করিয়া কাল সম্বন্ধে বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই কালের আদি আমাদের মত স্বরূপ-ভ্রষ্ট জীবের সৃষ্টিকে অবধি করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাতে নাই। তিনি স্বরূপ ভাবে আছেন, এবং স্বরূপ-ভ্রষ্ট যাহারা নহে, এমত জীবগণ

তাঁহার নিকট আছে। স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইলে সংসার এবং সংসারের সহিত খণ্ড কালের সমষ্টিরূপ সময়ের গণ্ডিতে জীব আসিয়া পড়েন—তখন হইতে আমরা যে ভাবে কাল বুঝি, সেই কালের অবধি কতকটা কল্পনা করা যায়, কিন্তু ব্রহ্মে যে কাল রহিয়াছে, তাহা অচিন্তনীয়। কালের এই প্রকার মীমাংসা করিলে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি ইত্যাদি কেবল কতকগুলি কথার (যাহা সহজে অনুভব-গম্য নহে) আশ্রয় লইতে হয় না। ব্রহ্ম যতদিন আছেন, ততদিন তাঁহার "eternal substance" হইতে "individual forms" (যাহা জীব ও জড় পদের বাচ্য) উদ্ভূত হইতেছে। তবে যে উপনিষদে সৃষ্টির পূর্ব্বে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার এমন অর্থ নহে যে, আমরা যাহাকে কাল বা সময় বলিয়া বুঝি, তাহারই গণ্ডির মধ্যে কোন সময়ের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের স্বরূপেমাত্র ছিলেন; তাহার পর তিনি নানা বিচিত্রতাময় এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যতদিন আছেন ততদিন তাঁহার সৃষ্টি বলুন, তাঁহার লীলা-বিলাস বলুন, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির অচিন্ত্য পরিণাম বলুন, যিনি যে ভাষাতেই সন্তুষ্ট থাকুন না কেন, ততদিন তাঁহার ঐ প্রকার একটা কিছু কাজ আছে। তবে শ্রুতিতে যে সৃষ্টির প্রাক্‌কালের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তাঁহাকে সৃষ্টি এবং সৃষ্ট বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা কিংবা দেখাইবার চেষ্টা মাত্র। এই চেষ্টা বা কল্পনা মানুষের অসাধ্য, কেবল ভগবদ্-নিশ্বসিত বেদাদি শাস্ত্রীয় বাক্যেই ইহার কিছু না কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। আমি এতদূর পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে বিবর্ত্ত-বাদ আমাদের মনে শান্তি আনিতে পারে না, ইহাই বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। অতঃপর পরিণাম-বাদের অন্য স্বরূপ

সম্বন্ধে যে একটু ইঙ্গিতমাত্র ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, তাহার বিষয় একটু বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরে যে চারিপ্রকার মতের কথা বিবৃত করিয়াছি, তাহা ব্যতীত সৃষ্টি সম্বন্ধে পৃথক্ মত বড় দেখা যায় না। এখানে প্রকাশ করা উচিত যে, কেহ কেহ বলেন স্বভাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে; যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মত বিশ্লেষণ করিলে তাহাতেও কোন সূক্ষ্ম কথা পাওয়া যায় না। উদয়নাচার্য্য এই মত বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। যাঁহারা "কুসুমাঞ্জলি" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই খণ্ডন অপরিচিত নহে। এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকটী স্মরণীয়।

"হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ।
স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ॥"

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার মত আছে যাহাকে শূন্যবাদ বলা হয়; যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদের মতে শূন্যই প্রকৃত বস্তু। এই মত আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ "সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে এইভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে:—

"যদসৎকারণৈস্তন্ন জায়তে শশশৃঙ্গবৎ॥
সতশ্চোৎপত্তিরিষ্টা চেজ্জনিতং জনয়েদয়ম্।
একস্য সদসদ্ভাবো বস্তুনো নোপপদ্যতে॥
একস্য সদসদ্ভ্যোঽপি বৈলক্ষণ্যং ন যুক্তিমৎ।
চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যং তত্ত্বমিতি স্থিতম্॥

চতুষ্কোটী কি? না, যাহা সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয়, এবং উভয়-অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, হইতে পৃথক নয়। এই প্রকৃত তত্ত্ব-পদার্থ চারি প্রকার কোটীর মধ্যে কোনটীরই অন্তর্গত নহে। ইহার মধ্যে

আপাততঃ আমার এখানে যাহা বলা প্রয়োজন, তাহা বিবর্ত্ত-বাদ-ঘটিত বিচারকালে কিছু বলিয়াছি। পূর্ব্বে যে চারি প্রকার মতের সংক্ষিপ্ত বিচার করিয়াছি, তাহাতে কি কি অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায় তাহা এখন দেখাইবার চেষ্টা করিব। আরম্ভ-বাদে যে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার কতক সঙ্কোচ করা হয় এবং তদনুযায়ী যুক্তি অবলম্বন করিলে যে বর্ত্তমান কালীয় বৈজ্ঞানিক জড়বাদীদের মতের কিছু পরিপুষ্টি করা হয়, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। পরিণাম-বাদ যাঁহারা মানেন, তাঁহাদেরও একদিকে পরম পদার্থ ব্রহ্মই হউক কিংবা দ্বিভাব-নিষ্ঠ, অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যের বীজাত্মক, কোন উপাদান বিশেষই হউক, অন্যদিকে নিত্য বস্তুদ্বয়ের মধ্যে এক শ্রেণীর বস্তুর সান্নিধ্যে দ্বিতীয় বস্তুর পরিণতি, ইহার একটী না একটী স্বীকার করিতেই হয়। এই দুই শ্রেণীর মতের যেটীই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে কিছু না কিছু বিপ্রতিপত্তি থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার বস্তু, তাঁহার পরিণাম যুক্তি ও সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। পুরুষ সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম কি প্রকার? "Double-faced unity বলিয়া কল্পিত কোন মূল উপাদান হইতে জড় ও চেতনের উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিলেও, তাহাতে সন্দেহ মিটে না; কারণ জড় হইতে চেতনের উৎপাদন কিংবা এক বস্তু হইতে জড় ও চেতনের পরিণতি অদ্যাপি কেহ করিতে পারেন নাই, বা তাহার অনুকূল কোন তর্ক ও কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। জড় ও চেতন যদি সম্পূর্ণভাবে পৃথক্, অর্থাৎ পরস্পর-বিজাতীয়, পদার্থ হইল, তাহা হইলে তাহাদের উপাদান এক বস্তু হইতে পারে না। আর, বহু পুরুষ ও পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম হয় মানিলে, তাহাতে যে সকল বিপ্রতিপত্তি ঘটে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি—পুরুষ বহু, ইহাদের মধ্যে কোন্ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম ঘটিয়া এই

জগতের সৃষ্টি হইয়াছে? সেই পুরুষ এখন কোথায়? এবং তদিতর পুরুষেরাই বা কি করিতেছেন, কোথায় আছেন? এবং প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের সান্নিধ্য এখন ঘটিতেছে কি না? যদি না ঘটে, তবে উহার কারণ কি? এই যে সান্নিধ্যের কথা বলা হয়, প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্য কখন কোন্ পুরুষের হইবে, ইহার নিয়ামকই বা কে এবং কি প্রকার? এই প্রকার বহুবিধ বিপ্রতিপত্তির সমাধান হয় না বলিয়া এই মতকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না।

তার পর, বিবর্ত্ত-বাদ এবং শূন্য-বাদের কথা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে ঐ মত যে এক প্রকার অজ্ঞেয় ইহা বলিতেই হইবে। উহাদের উপপত্তি করা অসম্ভব। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে শূন্যবাদ ও স্বভাববাদ কোন উপকারেই আইসে না, অথচ এই সকল মত ব্যতীত সৃষ্টিসম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার মত হইতে পারে না। ইহার মধ্যে কোন একটীকে স্বীকার না করিলে সৃষ্টিতত্ত্বের সমাধান করা যায় না; সুতরাং দেখিতে হইবে এই সকল মতের মধ্যে এমন কোন একটী পাওয়া যায় কিনা, যাহাকে কিছু প্রকারান্তর করিয়া আমরা যুক্তি-বলে গ্রহণ করিতে পারি। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আরম্ভ-বাদ এবং বস্তুর পরিণাম-বাদ, এই দুই মত বিচার-সহ নহে। শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি; ইহার দুই অবান্তর ভেদ আছে যথা:— শূন্য হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্র জগতের উৎপত্তি; এবং শূন্যই পরমতত্ত্ব, তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতেই উহার লয়। এই দুই ভাবের শূন্যবাদ আমাদের গ্রহণীয় নহে, স্বভাব-বাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ঐ মতের পরিষ্কার কোন অর্থ হয় না। এখন পারিশেষ্য-প্রণালী অনুসারে বিচার করিলে শক্তির পরিণাম বাদই পাওয়া যাইবে। ইহার বিষয় গোস্বামিগণ (যাঁহারা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আচার্য্য) নানা গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "তস্মাদ চিন্ত্যয়া শক্ত্যা নিরবয়বং সাবয়বঞ্চ ব্রহ্ম তয়ৈব পরিণাম মানমপি নির্ব্বিকারমেব তিষ্ঠতীতি শ্রৌতসিদ্ধান্তঃ। তস্মাৎ "তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ", ইত্যেবং লক্ষণং ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বং। তস্মান্নাসম্ভাবনীয়মপি। তথাচ সর্ব্বেষামেবাচিন্ত্যশক্তিকজগদ্বস্তূনাংমূলকারণস্য তস্যাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে সুতরামেব লব্ধে শ্রুতিদৃষ্টযুগপদ্বিকারাবিকারাদীনাং সাধনায় তাদৃশক্তিহীনানাং শুক্ত্যাদীনামিব বিবর্ত্তঃ সমাশ্রয়িতুমযুক্ত এব।" এই মতের বিশিষ্টতা এই যে, ইহাতে আরম্ভ-বাদের ন্যায় পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন প্রকার সঙ্কোচ করা হয় নাই; এবং ব্রহ্ম-পরিণামবাদের ন্যায় নির্ব্বিকার ব্রহ্ম-বস্তুর পরিণাম কল্পিত হয় নাই। ব্রহ্ম-বস্তুর পরিণাম মানিলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম বস্তুর পরিণাম সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক? কি হেতুই বা পরিণাম? এই সকল বিচিকিৎসা এই মতে ঘটে না; ইহাতে জড়বাদের প্রসঙ্গই নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের মধ্যে যুক্তিবিরোধী অংশগুলি ইহাতে একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, অথচ ব্রহ্মকেই জগতের একমাত্র কারণ বলা হইয়াছে; ব্রহ্মব্যতিরিক্ত এবং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পরমাণু প্রভৃতিকে নিত্য পদার্থ বলিয়া এই মতে স্বীকৃত হয় নাই। এই যে ব্রহ্মশক্তির পরিণাম-বাদ যাহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা সুধীবর্গের বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। সাম্প্রদায়িক মত মাত্র বলিয়া এদেশে এই মত এতদিন উপেক্ষিত রহিয়াছে। এমন কি টোলসম্বন্ধীয় সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা প্রভৃতিতেও পাঠ্যের মধ্যে উহার স্থান ছিল না। সংপ্রতি ঐ সম্বন্ধে কোন কোন গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। ভরসা করি যে, আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সমাজে উহার পঠন পাঠন প্রচলিত হইলে সকলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ মতের মধ্যে কি প্রকার সূক্ষ্ম বিচার-কৌশল আছে এবং কি প্রকার নিপুণতা সহকারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস এবং ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত ও যুক্তি-প্রণালী আলোচনা করিয়া ঐ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দার্শনিক বিচারে শ্রুতির বড় একটা ধার ধারিতেন না, কিন্তু "ষট্ সন্দর্ভ" এবং তাহার অনুব্যাখ্যা "সর্ব্বসংবাদিনী" নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে দেখা যাইবে, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রুতির কেমন সুন্দর আলোচনা ও মীমাংসা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই বাঙ্গালী, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থাদি আমাদের জাতীয় গৌরবের এক সর্ব্বপ্রধান বস্তু। তৎ সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। এই মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা এখানে অসম্ভব। ইতঃপূর্ব্বে যে সংস্কৃত বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে ইহাসম্বন্ধীয় সার কথাগুলি স্থূলভাবে বুঝা যাইবে। আরম্ভবাদে পরমেশ্বর ব্যতিরিক্ত ও পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নিত্য পরমাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরের শক্তি হইতে, অর্থাৎ ঐ শক্তি অচিন্ত্য ভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া অথচ পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম কিংবা তাঁহার শক্তিতে অবিকৃত রাখিয়া, এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিলে, পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন প্রকারে সঙ্কোচ করা হয় না। বস্তু-পরিণাম-বাদ স্বীকার করিলে একদিকে ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিতে হয় কিংবা ব্রহ্মকে উড়াইয়া দিয়া জড় ও চেতনাত্মক জগতের উৎপত্তির জন্য দ্বিভাবনিষ্ঠ কোন মূল বস্তুর উপাদানত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং অন্যদিকে চেতন পুরুষের সন্নিধানে জড় প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই

সকল মত স্বীকার করিলে বহুবিধ চিকিৎসার যে সম্ভাবনা থাকে, তাহা নিরাকৃত হইবার নহে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মের শক্তির অচিন্ত্য পরিণাম স্বীকার করিলে, ঐ সকল বিচিকিৎসা থাকে না। তবে অন্যবিধ এক প্রশ্ন উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শক্তির পরিণাম বলিলে ত ব্রহ্মেরও এক প্রকার পরিণাম স্বীকার করা হয়; আমি বলি তাহা হয় না; কারণ যাঁহারা ব্রহ্মের শক্তি মানেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মকে নির্গুণ না বলিয়া সগুণ বলেন, তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তির এক হিসাবে কিছু পার্থক্য না মানিয়াই পারেন না। যাঁহারা ব্রহ্মকে নির্গুণ বলেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া অনাশ্রয় এক মায়াশক্তির কল্পনা করিয়া জগতের উৎপত্তি বিষয়ে সমাধান করিতে হইয়াছে। এখানে অচিন্ত্য কথা লইয়া কিছু তর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও আমার বক্তব্য এই যে, অচিন্ত্য বলিলে কোন বিরুদ্ধ-ভাবের কল্পনা করা হয় না। যদি পরমেশ্বরের শক্তি বা অস্তিত্ব অচিন্ত্যই না হইবে, তাহা হইলে মানুষে ও পরমেশ্বরে কোন ভেদ থাকিত না। আমার স্মরণ হইতেছে যে, একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছিলেন:—"A known God will be no God."। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদিগকেও বলিতে শুনিয়াছি "পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বং ঈশ্বরত্বম্।" তাঁহারা এতদূর গিয়াছেন। আর এখানে অচিন্ত্য বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ কোন কথার অবতারণা করেন নাই; তাঁহারা বলিতেছেন যে, অচিন্ত্য শব্দের অর্থ যাহা আমাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণভাবে গম্য নহে, অর্থাৎ আমরা যাহাকে comprehend করিতে পারি না। সুতরাং পরমেশ্বরের শক্তিকে অচিন্ত্য বলা কিছুতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, অচিন্ত্য পদের অর্থ বিরুদ্ধ নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পরমেশ্বরের শক্তির অচিন্ত্য পরিণাম বলিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত সম্বন্ধে বিচিকিৎসাগুলি যে কেবল দূর হয় তাহা নহে, উহা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের অন্তর্বর্ত্তী প্রয়োজনীয় কথাগুলি আশ্চর্য্যভাবে সমন্বিত হয়।

এতদ্বারা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা হইল যে ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ অচিন্ত্যভাবে পরিণত হইয়া জড় ও চেতনাবিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রায় এই অর্থ লইয়াই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা জড় এবং চেতনাত্মক জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। Spinoza-ও জগৎকে "body of God" বলিয়াছেন, স্মরণ হইতেছে। ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ব্রহ্ম জগতের আশ্রয়, জগৎ ব্রহ্মের শক্তির অচিন্ত্য পরিণাম; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের পৃথক্ ও স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কিন্তু তিনি জগদতিরিক্তও বটে। ঔপনিষদিক ঋষিগণ এই ভাবটী কি ভাবে বুঝিতেন তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে তিনটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি, যথা :—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

"তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥

"পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাষড় ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ॥"

"Humanity, past, present and to come, conceived as the Great being" বলিয়া একপ্রকার কল্পনা ফরাসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ Auguste Comte করিয়াছেন; তাঁহার কল্পনার সহিত আমাদের দেশের ঋষিদের ঐ উক্তি তুলনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম ছিল। ব্রহ্মশক্তির এই প্রকার অচিন্ত্য পরিণাম স্বীকার করিলে জগতে সৃষ্টি এবং স্থিতি সম্বন্ধে কোন কাল লইয়া বিচারের আবশ্যকতা থাকে না। তিনি যতদিন, তাঁহার সৃষ্টিও ততদিন, এবং তাঁহার সৃষ্ট জড় ও চেতনাত্মক জগৎও ততদিন। তিনি ইহার আদি, ইহার মধ্য এবং ইহার অন্ত।

এখন তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? ইহার বিচারে দেখা যাইবে যে, তাঁহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের ঠিক স্বরূপ-অবস্থা নহে। আমরা নিজেরাই মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, আমাদের মনে প্রায় সকল বিষয়েরই একটী একটী উচ্চ আদর্শ (ideal) আছে এবং আমাদের বর্ত্তমান স্বভাব বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে সেই আদর্শ লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এমন ভাবে কি পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না, যাহাতে আমাদের ঐ মানসিক আদর্শ বাস্তবরূপে পরিণত করা যাইতে পারে? যদি না পারা যায়, তবে আমাদের মনে যে আদর্শ আছে তাহার কোন সার্থকতাই থাকে না। এরূপ বিচার করিয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে ভারতবর্ষীয় আচার্য্যেরা বদ্ধাবস্থা

বলিয়াছেন। কেন আমাদের বদ্ধাবস্থা ঘটিল, এই সম্বন্ধে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকলের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের অসম্পূর্ণতাই উক্ত বদ্ধাবস্থার মূল কারণ। কেহ কেহ বলেন, আদি পিতা মাতায় পাপ প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ইদানীং পাপের সঞ্চার হইয়াছে; এ কথার মধ্যে অধিকাংশই অসার। তাঁহারা আরও কহেন যে, জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া প্রথমে পাপের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু একথাটীর মধ্যে এক মহৎ সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। পরমেশ্বরের সৃষ্ট আমরা; সুতরাং আমরা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ হইতে পারি না। আমাদের স্বভাবের মধ্যে তটস্থ শক্তির ন্যায় পুণ্য ও পাপ এতদুভয়েরই যোগ্যতা আছে ঐ যোগ্যতা আছে বলিয়াই আমরা পুণ্য ও পাপের ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকি। যখনই আমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া পাপের পথে চলি, তখনই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আমাদের এক প্রকার ভক্ষণ করা হয়, অর্থাৎ পাপবুদ্ধির যোগ্যতাকে আমরা বিকশিত করি। ইহাকেই আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্মবন্ধ বলে। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পরমেশ্বর পরম কারুণিক হইয়া আমাদিগকে পুণ্য এবং পাপ এতদুভয়ের যোগ্যতা-বিশিষ্ট স্বভাব দিয়া কেন সৃষ্টি করিলেন? আমার উত্তর এই যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরম দয়ালু হইলেও তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না। যদি ঐ প্রকার শক্তি তাঁহার উপর আরোপ করা হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার অন্তর্ভূত বলিয়া, তাঁহাকে নাশ করিবার ক্ষমতাও তাঁহাতে আরোপ করা যাইতে পারে। তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। কাল্পনিক এবং আপাততঃ প্রতীয়মান ঐ দুই প্রকার শক্তি-সঙ্কোচকে, অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ কোন বস্তুর সৃষ্টি করা

কিংবা তাঁহার আত্মবিনাশ করার শক্তির অভাবকে, তাঁহার শক্তির সঙ্কোচ বলিয়া আমি আদৌ স্বীকার করি না। উহা তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল বা necessary consequence। এই কথা স্বীকার না করিলে, পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্টিরই এক প্রকার অপলাপ করা হয়। এই যে আমাদের অসম্পূর্ণতা, ইহা হইতেই আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম-বন্ধ এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমানে আমাদের স্বরূপ-বিচ্যুতি। আমাদের সাধন ভজন আর কিছুই নহে, আমাদের যে প্রকৃত স্বরূপ তাহারই পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান মাত্র। আচার্য্য শঙ্কর "বিবেকচূড়ামণি" গ্রন্থে প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্য-ভিধীয়তে।" আমরা আমাদের স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বা আমাদের স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটিলে কি হয় এবং আমাদের কি অবস্থাপ্রাপ্তি হয় তাহারও সুচারু মীমাংসা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দেখা যায়। "ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে" শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ভক্তির লক্ষণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

"অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভক্তি দুই প্রকার। এক উপায়-ভক্তি, অর্থাৎ যাহার সাধনার দ্বারা আমাদের স্বরূপ-বিচ্যুতি স্খলিত হইয়া যায় এবং পুনরায় স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটে; ইহারই নামান্তর সাধন-ভক্তি। অন্যটী হইতেছে উপেয়-ভক্তি, অর্থাৎ সাধন-ভক্তি দ্বারা যাহা প্রাপ্তি হওয়া যায়; ইহার নাম ভগবৎ-প্রেম। উপেয়-ভক্তি শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কথা মানুষের ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। যদিও এই সকল সাধন ভজনের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি আমাদের স্বরূপ-বিচ্যুতি ও পুনরায় স্বরূপ-প্রাপ্তির কথা দার্শনিক বিচারের অবশ্য অন্তর্গত। সুতরাং

উঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিতে পারি না। আমি আপনাদিগকে এই সকল তত্ত্ব স্বীকার করিতে ঠিক আহ্বান করিতেছি না; তবে আমার এখানে উহার কিঞ্চিদালোচনার উদ্দেশ্য এই যে, উহার সম্বন্ধে দার্শনিক-ভাবে উপপত্তি প্রদর্শন করা। আমরা পরমেশ্বরের আশ্রিত হইয়াও নিত্য, তিনি পরম নিত্য। সুতরাং আমাদের মধ্যে একটী প্রীতির সূত্র বা বন্ধন আছে। তাহা যিনি ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি ধন্য। আমি এখানে যাহা কিছু বলিলাম, তদ্দ্বারা কিছুমাত্র দিগ্‌দর্শন করিয়া আত্মশোধন করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও ধন্য হইব। আসুন, আমরা দার্শনিক ভাবে মননাদির দ্বারা এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করি এবং দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা বুঝিতে চেষ্টা করি।

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

মহাশয়ের অভিভাষণ

প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাজিয়া উঠে, "বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।" যে পবিত্র ক্ষেত্রে আজ আমাদের এই সম্মিলন ও উৎসব, ইহাই যে বঙ্গ-সভ্যতার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের জন্মভূমি, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। মিথিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতের সভাপর্ব্বে (সভা ৩০অ, ৩) গোপালকক্ষ নাম পাইয়াছিল, বায়ু এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে প্রদেশ গোমন্ত বা গোবিন্দ জাতির আবাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল (মার্কণ্ডেয় ৫৭ অ, ৪৪; বায়ু ৪৫অ, ১২৩), সেই প্রদেশের এক সময়ের গৌড়নাম আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমির অতি আদরের ও গৌরবের নাম। মৎস্যপুরাণকার বলেন (১২অ, ৩০) যে রাজা শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; গৌড়বহো কাব্যে পাই যে কবির সময়ের মগধের অধিপতি ঐ গৌড়দেশ এবং মগধের অধীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (৪১৩, ৪১৭, ৪১৮ ও ৪১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এল্‌বেরুনি দেখিয়া গিয়াছিলেন যে কুরুরাজ্যের থানেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে অলঙ্কৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে সে গৌড়দেশের প্রসারের কথা দূরে থাকুক, কুশনদীর কচ্ছপ্রদেশেও প্রাচীন গৌড় নাম প্রচলিত নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সহজলভ্য গ্রন্থ পড়িয়া হয় ত বিদ্যালয়ের বালকেরাও শিখিয়াছেন যে যাঁহারা পাল রাজা নামে খ্যাত তাঁহারা মুখ্য ভাবে এই মগধাদিদেশেই বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য বিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া শাসন করিতেছিলেন। বাক্‌পতির সময়ের মত তখনও এই রাজাদের গৌরবের উপাধি ছিল গৌড়-মগধেশ্বর। নারায়ণ-পালের উত্তরাধিকারীরা যখন আদি গৌড় ও মগধ হারাইয়া বঙ্গের একটি উপবিভাগে

আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন যে মিথিলা-মগধের জনস্রোত ও সভ্যতা-স্রোত বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ রাষ্ট্রকূট, গুর্জর প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীয় জাতির বিশেষত্বে চিহ্নিত হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। বলীর বংশের অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতীয় পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে পরিচিত লোকেরা পূর্ব্বকাল হইতে যে মগধের ভাষা, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তাহা অতি সুস্পষ্ট। মহীপাল যখন বরিন্দ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন লাভ করিয়াছিলেন, তখন মহানন্দার পশ্চিম পারে পূর্ব্বপুরুষদের আদিভূমিতে ক্ষমতা প্রসার করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহা গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভুতায় বিহার পরিবর্ত্তিত হইল; দেশের লোক মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিল, ভিন্ন অক্ষর লিখিয়া ভিন্ন ভাষা শিখিল, ভোজনের সামগ্রীতেও পরিবর্ত্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায় মগধের সভ্যতা ও গৌড়ী রীতি সুরক্ষিত হইয়া নূতন বিকাশ লাভ করিল। বিকাশের ধারাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আজ বঙ্গদেশে প্রাচীন মগধের সভ্যতার বড় ভাগের উত্তর উত্তরাধিকারী এবং আজ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের পরিস্ফুট প্রতিনিধি। তাই পরিবর্ত্তিত বিহারের লোকেরা আজ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না, এবং আমরাও এই প্রাচীন লীলাভূমিতে দেশবাসীর সাড়া না পাইয়া প্রাচীন-স্মৃতি বহন করিয়া বলিতেছি—"বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।"

তবে এই উৎসবের নাটমন্দিরে যদি বিশ্বজনীয় নূতন সুর ভাঁজিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বাঁশরী আবার বাজিত; ভারতীর পূজার মণ্ডপে পুরোহিতেরা যদি বিশ্বজনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন,

তাহা হইলে হয় ত সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। কেবল যে এ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাস গাঁথা পড়িয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল প্রদেশের ও সকল জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলি, এবং ঐ দেশের মধ্যেই সকল প্রাচীনতা খুঁজিবার লোভে যদি কালিদাসকে নবদ্বীপে জন্ম লইতে বাধ্য করি, আর্য্যভট্টের নাম হইতে ভাটপাড়ার উৎপত্তি মনে করি, সুন্দরবনকে বেদের আরণ্যকভাগের জনিত্র বলি, এবং সর্ব্বশেষে বহরমপুরকে ব্রহ্মপুর করিয়া সেখানকার মাটি হইতে স্বয়ং ব্রহ্মার আদি পদ্মাসনে 'ফসিল্' তুলি, তাহা হইলে আওরংজেবের আমলের পালিস্-করা পাথর কিংবা নেপালী মালমস্‌লা আমাদের ইতিহাসের মন্দির গড়িবার সময় কাজে লাগিবে না, এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন্দিরে কোন সার্ব্বভৌম পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আসিবেন না। "পাল" কথাটি যাঁহাদের নামে সমাসে যোড়া পাওয়া যায় বলিয়া যাঁহারা পাল নামে কীর্ত্তিত, তাঁহাদের প্রথম আমলের রাজাদের শরীর যদি খাঁটি বাঙ্গলার মাটির গড়ন না হয়, তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসকে লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয় না। পিতৃপুরুষদের ঐতিহাসিক তর্পণে যদি বংশপ্রবর্ত্তক চল্লিশজন ঋষির নামের সঙ্গে সঙ্গে বলীর দ্রবিড়-মেলের পুত্রদিগকে স্মরণ না করি তাহা হইলে কেবল ঐতিহাসিক সিদ্ধির গায়েই জল দেওয়া হইবে।

এখানে বড় বড় ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে আসি নাই,—ক্ষমতাও নাই। আমি ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত নহি। কথাটা বিনয়ের অভিনয়ের জন্য বলি নাই;

এখনও যে দেবীর মন্দির গড়া হয় নাই, সেখানকার কাজের জন্ত কেহই এখনও পৌরোহিত্য পায় নাই। কেহ বা মাটি খুঁড়িতেছে, কেহ বা পাথর কুড়াইতেছে, কেহ বা দেশে দেশে বিবিধ জাতির লোকের কাছে উপযুক্ত মালমস্‌লার অনুসন্ধান করিতেছে। যাঁহারা গাড়ি গাড়ি মাল ঢোলাই করিতেছেন তাঁহাদের গাড়িতে কখনও কখনও দুই একটুকরা উপকরণ তুলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ এই বৃহৎ উৎসবের দিনে আমার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে সেজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ এই সুবিধায় যাঁহারা ইতিহাসের উপাদানের ভার বহিতেছেন, এবং যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইতে চাহিতেছেন, বিশেষ ভাবে তাঁহাদের উদ্দেশে দুই চারিটি কথা বলিব। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা হইতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পর্য্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে যে-সকল উপকরণ রক্ষিত হইতেছে, তাহা বাছাই করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ কারিগরেরা মন্দির গড়িবেন, এবং খ্যাতি লাভ করিবেন; মন্দিরের ভবিষ্যৎ পুরোহিতেরা বিলক্ষণ দক্ষিণা পাইয়া সুখী হইবেন। সেই যশ এবং দক্ষিণা এখন লাভ করিবার জন্য যদি কোন ভারবাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎসুক হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন না। সংগৃহীত পাথরের দুচারিখানি সাজাইয়া যদি কেহ ঘর গড়িয়াছেন ভাবেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে সাহিত্য চিত্ত-বিনোদনের জন্য, তাহার পাকা মন্দিরে চণ্ডিদাসের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া আসিতেছে, অনেক সুস্বাদু ভোগ নিবেদিত হইতেছে। সে ভোগের লোভে সে মন্দিরের দরজায় আমরা সকলেই হুড়াহুড়ি করিয়া থাকি; এমন কি ইয়োরোপ আমেরিকার লোকেরাও হাত পাতিয়া ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের একালের কবি পুরোহিতকে

অনেক দক্ষিণা দিয়াছে। ইতিহাস লইয়া এত গৌরব লাভের দিন এখনও আসে নাই; সেদিন বহুদূরে। এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে পাই যে চারিদিকের চালাঘরে কেবলই ইট পাথরের পালা, এবং কোথায়ও বা প্রত্নতত্ত্বের ঢেঁকিতে, ব্যাকরণের মুষলে খানকতক ইট ভাঙ্গিয়া সুরকি করা হইতেছে। যাহারা খ্যাতি ও দক্ষিণা চাহেন, এই কচ্‌কচির ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান নাই। যাঁহারা একথা বুঝিয়া-সুঝিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারবাহক হইতে চাহেন, তাঁহারাই নিষ্কাম ব্রত লইয়া আসুন।

এখানে খ্যাতিও নাই দক্ষিণাও নাই, বরং উল্টা একটুখানি নিগ্রহ লাভের সম্ভাবনা আছে। সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া যে ঘটনা ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; উহাতে যদি চিরদিনের পোষা সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগে, যদি আপনার দলের লোকেরা অন্যদলের লোকের কাছে উপহসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন রীতি বা অনুষ্ঠান অসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও অসঙ্কোচে সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। ইয়োরোপের বিজ্ঞান ও ইতিহাস-মন্দিরে বড় বড় পুরোহিতেরা অসঙ্কোচে প্রচার করিতেছেন যে দৈবাৎ যদি তাঁহাদের দেশের লোকের শরীরে আর্য্য নামক কোন জাতির রক্ত থাকে তবে উহা ছিটেফোঁটার অধিক নহে; একটা নিগ্রোপ্রায় জাতির সহিত আল্লাইন জাতির সংস্রবে যে বেশীর ভাগ ইয়োরোপীয় জাতির উৎপত্তি, একথা সুস্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে। কেহ যদি সুপদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন যে সেকালের আর্য্যেরা এবং একালের আমরা খাঁটি কুলীন বংশেই জন্মিয়া আসিয়াছি, সে ত ভাল কথা। কিন্তু যদি একটু উল্টা কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি আমরা সত্যকাম জাবালের

মত নির্ভীক হইতে পারিব না? কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে আমি ইতিহাসের ধান ভানিতে আসিয়া নৃতত্ত্বের শিবের গীতের দৃষ্টান্ত দিতেছি কেন? নৃতত্ত্ব না হইলে যে ইতিহাস হয় না তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আর্য্য এবং আর্য্যেতর জাতি লইয়াই ভারতবর্ষ, এবং সংখ্যায় আর্য্যেতরেরাই অত্যন্ত অধিক। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের ভাষায়, ধর্ম্মে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে যে আর্য্যেতর জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা আর্য্যেতর জাতির তথ্য না জানিলে কেহ ধরিতে পারিবেন না। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে ও মিশ্রণে কেমন করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে এই জাতির শরীর, মন, প্রবৃত্তি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ভাষা ও সামাজিক অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেই ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। যথার্থ ইতিহাস কি তাহা ভুলিয়া যাই বলিয়াই যখন কোন প্রাচীন সময়ের একখানি ক্ষুদ্র দান-লিপিতে কোন একটি বিস্মৃত প্রদেশজয়ী রাজার একখানি গ্রাম-দানের বিবরণ পড়ি, তখন উহা হইতে ইতিহাসের কোন উপাদান না পাইলেও অনির্দ্দিষ্ট একজন প্রাচীন রাজার বীরত্ব, বদান্যতা প্রভৃতির বর্ণনায় শতাধিক পৃষ্ঠা লিখিবার উদ্যোগ করিয়া থাকি। একজন রাজা নিষ্ঠুর হইতে পারে, বা দয়ালু হইতে পারে, বা আর কিছু হইতে পারে; কিন্তু জাতি-সাধারণের অবস্থা বা চরিত্র বুঝিতে হইলে, দেশের লোকের ধাত বুঝিতে হইলে, তিন ছত্রের তাম্রফলকের লুপ্ত রাজার নাড়ি টিপিয়া কিছু বুঝিতে পারা যায় না। রাজাদের নামের তালিকা, ও দেশ জয়ের বিবরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহাতে লোক-সাধারণের কোন বিবরণের আভাস পাওয়া যায় না তাহা ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র উপাদান মাত্র। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে, হইবে এবং হওয়া উচিত। কিন্তু আর্য্যেতর জাতিসমূহের শরীর, ভাষা, ধর্ম্ম-

বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সুমার্জ্জিত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মত পবিত্র, পূজ্য, এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া চাই। নৃতত্ত্বই যে ইতিহাসের গোড়া, বিভিন্ন অবস্থায় লোক-সাধারণের পরিবর্ত্তনের বিবরণই যে যথার্থ ইতিহাস, ইয়োরোপেও তাহা অল্পদিন পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহার বশবর্ত্তী হইয়াই উঁহারা বলিতেন, এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবর্ষে কখনও ইতিহাস লিখিত হয় নাই। নূতন ভাব লইয়া আমরা বলিতে পারি যে কোন দেশেই হয় নাই।

ইয়োরোপের অবস্থা ও প্রকৃতির ফলে সেখানে যাহা ছিল বা আছে, তাহা যদি আমাদের না থাকে, তবে যে অবস্থার ফলে তাহা আমাদের নাই, তাহা বুঝিয়া লইয়া ভারতের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস বুঝিবার পথ পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেঁট্ করিয়া একটা গোঁজামিল দিয়া ইয়োরোপীয়দের কাছে একটা কাল্পনিক অবস্থা খাড়া করা চলে না। আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটিয়া গেলে যেখানে সকলেরই মিলিত বংশধরেরা এক ঐতিহ্য মাথায় বহিয়া চলে, সেখানে বিবাদের দিনের দলবিশেষের গৌরবের কথা লইয়া এক-একটা বিশেষ বিশেষ জাতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রচিত হইতে পারে না। বিদেশ হইতে শক, যবন, হূনেরা আসিয়া যখন একেবারে আমাদের সমাজশরীরে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল, তখন বিশেষ ভাবে দ্বন্দ্বজনিত কোন এক পক্ষের গৌরবের কথা স্বতন্ত্র সাহিত্যে রক্ষিত হইয়া আদৃত হইতে পারে নাই। কোন প্রদেশেই এমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নাই যাহাতে জাতিতে জাতিতে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারিয়াছিল কিংবা ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইতে পারিয়াছিল। অতি-প্রাচীন গল্পে পড়ি যে নির্ব্বাসিত রাজপুত্র প্রচুর বললাভ করিয়াও প্রাচীন রাজ্য-লাভের

উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের বা "অরণ্য ঠানে রজ্জম্ মাপেস্‌সামি" বলিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়াছেন, তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক বুভুক্ষু জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিবার প্রচুর স্থান পাইয়াছিল এবং ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিল। সেকালের সকলেই হিদেন ছিল বলিয়া পরস্পরের মিলনে বাধা হয় নাই। পরে যখন অন্য জাতির লোকেরা আসিলেন, এবং নূতন রকমের ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষত্বটুকু ষোল আনা বজায় রাখিবেন, তখনকার দ্বন্দ্বে ইয়োরোপীয় ধরণের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহারা দ্রবিড় জাতীয়ের বঙ্গভূমিতে আর্য্য-সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের লোকদিগকে আর্য্য-আদর্শ হইবার জন্য কোন প্রকার পীড়ন করেন নাই; দেশের লোক নূতনত্বের সৌন্দর্য্যে অথবা গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই নূতন লোকদিগের মিত্র প্রতিবেশী হইয়াছিল, এবং গুণ এবং ক্ষমতা দেখিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্যই নূতনকে শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রসারের সময়েও কোনও উৎপীড়ন ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদের নামে যতই দুর্নাম থাকুক, তাঁহারা যাচিয়া যাচিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্রবিড় জাতীয়দিগকে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য পুরোহিত দিয়াছিলেন, এবং শূদ্রবর্গের প্রসার বাড়াইয়া দিয়া শূদ্রের নবশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েরাও যাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ করিত না, তাহাদিগকে ইহাঁরাও স্পর্শ করেন নাই, অথবা দ্রবিড়ের কাছেও মান মর্য্যাদা রাখিতে হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে বাঙ্গলায় আর্য্য আগমনের কোন্ গৌরবের কথা সোৎসাহে ও সাগ্রহে পড়িবার

মত ছিল যে সেই কথা লইয়া সেই সময়ে ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইবে? যত জ্ঞাতব্য বা শিক্ষাপ্রদ হউক না কেন, যাহাতে রক্ত গরম করিবার মত উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ যেন ইতিহাসই বলিতে চাহেন না। এ ভ্রান্তি না গেলে আমাদের ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি যে ঘুচিতেছে, ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ যে চিহ্নিত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি; কাজেই আশায় ও আনন্দে বলিতে পারি যে আমাদের ইতিহাসের বিপুল ও সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবাহীর পরিশ্রম সফল হইবে।

৯ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

শ্রীযুক্ত শশধর রায়

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত শশধর রায়

মহাশয়ের অভিভাষণ

আপনারা আমাকে এই গৌরবান্বিত পদে মনোনীত করায় আমি আপনাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি জানি, আমি এই আসনের যোগ্য নহি। দেশ বিখ্যাত জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এই আসন অধিকার করা আমার শোভা পায় না। তথাপি আপনাদিগের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। জানি না কোন্ হেতু ভগবান আপনাদিগের মুখ হইতে এই আদেশ বাহির করিয়াছেন; কিন্তু জানি, ইহাকে আমি অকৃত্রিম ভালবাসি।

বিজ্ঞানের প্রধান্য।

বিজ্ঞানালোচনাকে ইহকাল এবং পরকালেরও সম্বল বলিয়া মনে করি। এ কথা বহুবার বলিয়াছি; কখনও বা এ নিমিত্ত কিঞ্চিৎ তিরস্কৃতও হইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞানকে আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ ভাবে আলোচ্য বলিয়া আমার যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। এই বিজ্ঞান শাখারই স্বতন্ত্র অধিবেশন যে কি কষ্টে সাধন করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যে জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানযোগী ডাঃ রায়ের আবির্ভাবে আমাদের দেশ পূজ্য হইয়াছে, তাঁহার সহায়তাই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তিনি চুঁচুড়াতে আমাদিগের এই শাখার প্রথম সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া এই শাখার, সুতরাং অন্যান্য শাখারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর করিয়াছিলেন। সে দিনের কথা মনে করিয়া আনন্দে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই দিন আমরা সম্মিলনক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথম আশা কার্য্যে পরিণত করি।

যা'ক, সে গর্ব্ব প্রকাশ আজি শোভনীয় না হইতে পারে।

হয় ত, কাহারও বা অপ্রীতিকরও হইতে পারে। সুতরাং আমি আর তাহা উল্লেখ করিব না।

আমার ন্যায় ব্যক্তির নিকট আপনারা কি আশা করেন? আমি কি জানি? আপনাদিগকে কি বুঝাইব? আমি স্বয়ং অসিদ্ধ, আপনাদিগকে সিদ্ধির পথ দেখাইব কি করিয়া? গভীর গবেষণা-সম্ভূত তথ্য, আমি কোথায় পাইব? তথাপিও আমার যে দুই একটা কথা বলিবার আছে, তাহাও যদি যথাযোগ্য ভাবে বলিতে পারিতাম, যদি আপনাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানতৃষ্ণা আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিতাম, তাহা হইলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতাম।

আবশ্যকতা।

আমাদিগের এই বিজ্ঞান শাখার, এমন কি, সাহিত্য-সম্মিলনেরই বা আবশ্যকতা কি? আমরা কি কারণে বর্ষে বর্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, নানা আয়াস স্বীকার করিয়া নানা স্থানে সম্মিলিত হইতেছি? কোন্ আশা, কোন্ আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতেছে? ইহাই পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আত্ম-দর্শন, আত্ম-বিশ্লেষণ অবস্থাতেই, বিশেষতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমরা জাতীয় উন্নতির আশাকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছি। এ আশা আমরা জীবনের মূল মন্ত্র করিয়াছি। ইহার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে। আর বুঝিয়াছি, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে। এই কারণেই আমরা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত এত আয়াস স্বীকার করিতেছি। এই নিমিত্তই বর্ষে বর্ষে নানা স্থানে সম্মিলিত হইতেছি।

আলোচ্য বিজ্ঞান।

জাতীয় উন্নতি—কথাটী বলিতে ও শুনিতে মন প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমরা ধনে, জনে, জ্ঞানে, সামর্থ্যে অতিগৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আজি সে ধনবল নাই, সে জনবল নাই, সে জ্ঞানবল নাই। আমরা কত উচ্চ হইতে কত নিম্নে পতিত হইয়াছি। একথা মনে করিতেও দেহ মন অবসন্ন হয়। আজি বিধাতার আশীর্ব্বাদে, আমাদিগের এ অবসাদ, এ তন্দ্রা, এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে। আমরা জাগিতে চাই, আমরা উঠিতে চাই, আমরা সভ্য সমাজে দশজনের একজন হইতে চাই। ধন ধার করিয়া, জন ভাড়া করিয়া, জ্ঞান অপহরণ করিয়া নতশিরে জীবন যাপন করিতে চাই না। আমাদের এ আশা কি দুরাশা? ধন এখন বিজ্ঞানের অধীন; লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ এখন মীমাংসা হইয়া গিয়াছে! রসায়ন শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনা এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ভিন্ন ধনাগমের আশা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। জনও বিজ্ঞান সাপেক্ষ। সুপ্রজনন শাস্ত্র, (Eugenics) ধাত্রীবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, দ্রব্যগুণতত্ত্ব, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, এ সকল আলোচনা ও প্রয়োগ করা ব্যতীত জনবল লাভের আশাও সুদূর পরাহত। ধনে জনে জ্ঞানে বড় হইতে চাই; এ সকলই একমাত্র জ্ঞানের আয়ত্ত। সুতরাং উপরে যে সকল শাস্ত্রের উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগের আলোচনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জ্ঞানবল সকল বলের রাজা; জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তি আমরা বহু শতাব্দী হইতে হারাইয়াছিলাম। কিন্তু কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশত বর্ষ হইল যে দুই মহাত্মা এতদ্দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, সেই ডাঃ বসু এবং ডাঃ রায় স্ব স্ব সাধনা দ্বারা দেখাইতেছেন,

আমরা আর পরের ধনে পোদ্দারী করিতে সম্মত নহি। আমরা আর ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া, পরের জ্ঞানে জ্ঞানবান হইবার ভাণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের নিকট হইতে জগৎ চিরদিন ধার করিয়াছে, আবারও করিবে। অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমান্ তারিণীচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল চৌধুরী, শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা বহু জ্ঞান লাভ করতঃ মানব সমাজকে ঋণী করিতেছেন। জ্ঞানে মানুষ মানুষ হয়। ভাবে হয় না, তাহা বলিতেছি না। ভাবেও হয়, জ্ঞানেও হয়। আমাদিগের ন্যায় ভাবের দেশ কোথায় আছে? আমাদিগের ন্যায় কাব্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান কোথাও নাই। আমাদিগের ন্যায় জ্ঞান চর্চ্চা, সর্ব্বত্যাগী জ্ঞান চর্চ্চা কোথাও ছিল না, কোথাও নাই। আমরা আবার সেই ভাব রাজ্যে, আবার সেই জ্ঞান রাজ্যে জগতের সমক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে চাই। শুধু তাহাই নহে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে দাঁড়াইব। মানবসমাজে আমাদিগের ভাবময়, জ্ঞান ও নীতিমূলক সভ্যতার প্রয়োজন আছে। বিধাতার জগতে হিন্দু জাতির মনুষ্যত্ব-প্রধান বিশেষ সভ্যতার আবশ্যকতা আছে; মানুষকে মানুষ করিতে হইলে আবশ্যকতা আছে। তাই, আমরা মরিয়াও মরি নাই।

আমরা মরণোন্মুখ জাতি নহি।

যাঁহারা বলেন, [আমিও কদাচিৎ না বলিয়াছি তাহা নহে] আমরা মরণোন্মুখ জাতি, তাঁহারা আমাদিগের আশার মূলে অন্যায় কুঠারাঘাত

করেন। সব গেলেও প্রজনন শক্তির বিশেষ হানি না হইলে, কোন জাতিই মরে না। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে আমার কৃত উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় লোক পরীক্ষার ফল আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আপনাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি দেখাইয়াছিলাম, বিগত প্রায় একশত বর্ষ মধ্যে আমাদিগের জনন শক্তি হ্রাস ত হয়-ই নাই, বরং কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর ৫০ বলাম ১ খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা হইতেও তাহাই জানা যায়। "The Hindus have made the greatest advance (6. 6 P. C.) in Eastern Bengal * * * where the people seem to have unusual procreative energy" ইহা অমিশ্র আনন্দের হেতু না হইতে পারে, কিন্তু মরণোন্মুখের নৈরাশ্য হইতে অনেক দূরে, সন্দেহ নাই। আমরা আত্মহত্যা না করিলে মরিব না। গত ৩০ বৎসরে হিন্দুজাতি শতকরা ১৬, এবং মুসলমানগণ শতকরা ২৯ জন বাড়িয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণের বৃদ্ধির হার তৎপূর্ব্ব দশ বৎসরের তুলনায় শতকরা ২·৩ কমিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও জননশক্তির হ্রাস হওয়া দেখা যাইতেছে না। মুসলমানগণের জননশক্তি হিন্দু অপেক্ষা অধিক; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দুগণের সহিত অধিক পার্থক্য নাই। তাঁহাদিগেরও জননশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হওয়া দেখা যায় না। এ অবস্থায় আমরা মরণোন্মুখ জাতি নহি। তবে নানা কারণে কিছুদিন হইল আধমরা হইয়া পড়িয়া আছি, একথা বলিলে স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারি। কিন্তু সময়োচিত ঔষধ পাইলে বাঁচিব-ই। সে ঔষধ কি? কোন্ ঔষধের অভাবে পুরাকালে বহু জাতি উন্নত হইয়াও পতিত হইয়া গেল? আজি ধরাতলে তাহারা কথামাত্রে পরিণত হইয়াছে কেন?

ঐতিহাসিক যাহাই বলুন, তাহারা মানুষ গড়িতে জানে নাই বলিয়াই পতিত হইয়াছে। মানুষই সমাজের একমাত্র সম্পত্তি; সেই মানুষ যদি স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, ধনে, বংশে, চরিত্রে হীন হইয়া যায়, তবে সমাজ উন্নত হইবে কেমন করিয়া! পর পর বংশ ক্রমেই অধঃপতিত হইলে সমাজ কখনই উন্নত উন্নত থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় সমাজ অধঃপতিত হইবেই।

মানুষ গঠন অসম্ভব নহে।

মানুষ গড়িব কেমন করিয়া? মানুষ কি গড়া যায়? বিজ্ঞান বলিতেছে, গড়া যায়; অন্ততঃ, গড়া যায় না, একথা নীরবে স্বীকৃত হইতে পারে না। এক দিকে মানবসমাজ কোন দিনই বিশেষ চেষ্টা করে নাই; সে চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবকে বংশপরম্পরায় উন্নত করা, পতিত সমাজকে উদ্ধার করা, ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এবিষয়ে জীব-বিজ্ঞান কি বলিতেছে, জীববিজ্ঞান কোন আশার বাণী লইয়া আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে; তাহাই আমি আপনাদিগের সমক্ষে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। আপনারা এ বিদ্যায় মানবসমাজের অগ্রণী হউন ইহাই আমার ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ইহার বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে, সেই জাতিই মানবসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিদ্যা কি? ইহার উদ্দেশ্য কি? কি উপায়ে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? এ বিদ্যার জন্মদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সার ফ্রান্সিসগল্যাণ্টেন মহোদয়ের ভাষাই আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিতেছেন, Eugenics is the science which deals with all influences that improve the inborn qualities of a race; also those that

develop them to the utmost advantage" যে সকল কারণে জাতিস্থ ব্যক্তিগণের জন্মগত গুণসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তির জীবনে ঐ গুণসকল পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া সমাজের কল্যাণকর হয়, সেই সকল কারণ আলোচনা করা Engenics অর্থাৎ সুপ্রজনন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকেই একএকটী জন্মগত ব্যক্তিত্ব লইয়া জাত হন; পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার বিনাশ অথবা বিকাশসাধন করিতে পারে; কিন্তু যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে পারে না। * একটী জাতিমধ্যে সকলেই জন্মগত গুণের অধিকারী হইতে পারে না; এবং সকলকেই সমান গুণে গুণবান করা যায় না।

সমাজে কি প্রকার ব্যক্তি, কি চরিত্রের ব্যক্তি অধিক হইলে উপকার অধিক হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও বহু মতভেদ হওয়া সম্ভব। এ নিমিত্ত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া, সমাজে বর্ত্তমান কালে যে সকল বিবিধ প্রকার গুণী ব্যক্তির সদ্ভাব দেখা যাইতেছে, এবং যে প্রকার চরিত্রের ব্যক্তি সর্ব্ববাদি-সম্মত রূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, সেই প্রকার ব্যক্তিই যাহাতে অধিক পরিমাণে জাত হইতে পারেন, তদ্রূপ নিয়ম সকল যথাসম্ভব আলোচনা করিতে পারিলেই প্রথম প্রথম সুপ্রজনক শাস্ত্রালোচনা সফল হয়। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সৈনিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, প্রভৃতির নানা শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে সমাজের উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন।

* We have no experience of any means by which transmisson may be made to deviate from its course; nor from the mount of fertilization pick out the particles of evil in that zygote or put in one particle of good.

Thomson's Heredity 507.

আর, সকলেই সুস্থ, সবল, নীতিমান, সৎসাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এ নিমিত্ত এ সকল ব্যক্তি মধ্যে যিনি সমাজের যে স্তর অধিকার করিয়া আছেন, সেই স্তরই অথবা তদপেক্ষা উন্নত স্তর যাহাতে আরও উত্তমরূপে অধিকার করিতে পারেন; যাহাতে সমাজে নূতন নূতন উপকারজনক অনুষ্ঠান একাগ্রতার সহিত প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন ও সে সকলে সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হন, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তদনুরূপ গুণী বংশসম্ভূত নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা, উত্তম অপত্য লাভের একমাত্র সাধারণ নিয়ম। এদিকে দৃষ্টি করিতেই হইবে। ঈদৃশ ব্যক্তিগণ দ্বারা পর বংশের অধিকাংশ গঠিত করিতেই হইবে। নচেৎ যে কোন প্রকারে বিবাহরূপ দায় নিষ্পন্ন করিয়া হাত ঝাড়িয়া বসিয়া থাকিলে, সমাজ অধঃপতিত হইবেই। তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না।

কে পর বংশ গঠন করিবেন ?

সকল সমাজেই কৃতী, অকৃতী, বুদ্ধিমান, নির্ব্বোধ, ভীরু, সাহসী, রুগ্ন, সবল, অপরাধী, নিরপরাধী, সমাজদ্রোহী ও সমাজসেবক ব্যক্তি আছে। যদি কোন সমাজে কোন সময়ে কৃতী অপেক্ষা অকৃতীর, সাহসী অপেক্ষা ভীরুর, সুস্থ অপেক্ষা রুগ্নের, সবল অপেক্ষা দুর্ব্বলের, নিরপরাধী অপেক্ষা অপরাধীর, ধীর অপেক্ষা অধীরের, সমাজ সেবক অপেক্ষা সমাজদ্রোহীগণের সংখ্যা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, তবে সে সমাজের অবস্থা সে সময়ে কেমন হয়? সকলেই বলিবেন, সে সমাজ তখন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়।

যদি ঐ সমাজে অকৃতীগণ, ভীরুগণ, দুর্জ্জনগণ, সমাজদ্রোহীগণ

পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করে; স্ব স্ব অযোগ্যতা দ্বারা পরবংশের অধিকাংশ নরনারীকে দূষিত করে; তবে সে সমাজ তখন অধঃপতনের দিকে আরও দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কৃতী সজ্জনগণ সমাজে যত অধিক থাকেন, সমাজ ততই উন্নত হয়; অকৃতীর সংখ্যা সমাজে অধিক হইলে সমাজ পতিত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে, কৃতী ও সজ্জনগণ পরবংশ অথবা তাহার অধিকাংশ গঠিত করিলে সমাজের মঙ্গল হয়; অকৃতী ও দুর্জ্জনগণ পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করিলে মঙ্গল নাই। এটী মোটা কথা। এ কথা আরও ডুবিয়া বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ডাদি দেশে স্থূলতঃ এক পুরুষের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণের ষষ্ঠাংশ দ্বারা পর-বংশের অর্দ্ধাংশ গঠিত হয়। কিন্তু সে সকল দেশে বহু নরনারী অবি-বাহিত থাকেন। এতদ্দেশে প্রায় সকলেই প্রায় বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং এতদ্দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর অংশ দ্বারা পরবংশের কত অংশ গঠিত হয়, তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত না হইলে বলা যায় না। এক পুরুষের জনসংখ্যার কত অংশ পরবংশের কত অংশ গঠিত করে, তাহা না জানা গেলেও, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এতদ্দেশে এক পুরুষের একটা বৃহৎ অংশ পরবংশের একটী বৃহৎ অংশ গঠিত করে। যদিও এই ভাগ্যহীন সমাজে বহু শিশু জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এক বৎসর বয়স না হইতেই তাহাদিগের পঞ্চমাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে কত রত্ন জীবিত থাকিলে পরবংশ উজ্জ্বল করিতে পারিত, তাহা কে বলিতে পারে? এক পুরুষের যে অংশ পরবংশের যে অংশই গঠিত করুক, ঐ প্রথমোক্ত অংশ স্বাস্থ্যে উদ্যমে, সাহসে ধীরতায়, নীতিজ্ঞানে যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান বাঙ্গলার জনসংখ্যা ন্যূনাধিক ৪॥০ কোটী; তন্মধ্যে একটা বৃহৎ অংশের ঐ সকল গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। নচেৎ

উহার বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা পরবংশ গঠিত হইলে সমাজ উন্নত থাকিতে পারে না।

যোগ্যাযোগ্যের বংশানুক্রম।

এ স্থলে আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তির অপত্য যোগ্য হয়, অযোগ্যের অপত্য অযোগ্য হয়। যদিও এ নিয়মের ব্যভিচার কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণতঃ এ নিয়ম সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

কে যোগ্য ও কৃতী ?

এ স্থলে যোগ্য অর্থে দেশ ও কালের উপযোগী; অনুকূল অবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝিতে হইবে। কৃতী অর্থে যিনি পূর্ব্বাবস্থার উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে অথবা একই সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিকে যোগ্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং এ শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ হইতে পারে না। তথাপি, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সকল সমাজে সকল সময়েই রুগ্ন অপেক্ষা সুস্থ যোগ্য, দুর্ব্বল অপেক্ষা সবল, ভীরু অপেক্ষা সৎ সাহসী, চঞ্চল অপেক্ষা একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ব্বোধ অপেক্ষা বুদ্ধিমান, দুরাচার অপেক্ষা সজ্জন, যোগ্য। বলিয়াছি যোগ্য হইতে যোগ্য এবং অযোগ্য হইতে অযোগ্যই সাধারণতঃ জাত হইয়া থাকে। তথাপি অনুসন্ধান করিলে এতদ্বিপরীতও লক্ষ্য হইয়া থাকে। গ্যালটন এ সকল অনুসন্ধানের পথ প্রদর্শক। তিনি বহু পরিবারে অনুসন্ধান করিয়া ২৫০০ অতি অযোগ্য ব্যক্তির ৩ জন মাত্র সুযোগ্য

অপত্য পাইয়াছিলেন; কিন্তু কেবল মাত্র ৩৫ জন সুযোগ্য ব্যক্তিরই উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬জন সুযোগ্য অপত্য পাইয়াছিলেন। ১৮০ জন সুযোগ্যের ১০ জন সুযোগ্য অপত্য দেখা গিয়াছিল; কিন্তু ১৩১৪ জন অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ব্যক্তির ৫ জন সুযোগ্য অপত্যের ঊর্দ্ধ পাওয়া যায় নাই। সকল দেশেই ভদ্রলোকের মধ্যে যোগ্যের সংখ্যা অধিক ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অল্প দেখা যায়। এই সকল আলোচনা করিয়া গ্যাল্টন বলেন, "The Lower classes make their scores owing to their Quantity and not to their Quality."* অর্থাৎ যাহারা যোগ্যতায় নিম্নশ্রেণীর তাহাদিগের বহু সংখ্যক মধ্যে অত্যল্প উত্তম অপত্য জাত হয়; সংখ্যাই তাহাদিগকে জয়যুক্ত করে; গুণে নহে। সুতরাং নির্গুণ ব্যক্তিগণের বহু অপত্য উৎপাদন করায় ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক। ইহা অব্যভিচারী নিয়ম নহে, তবে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বংশানুক্রমিক পীড়াগ্রস্ত, তাহার অপত্য ঐ পীড়া পাইবার সম্ভাবনা অধিক; যে অধীর, নির্ব্বোধ, দুষ্কর্ম্মী, তাহারও তদ্রূপ অপত্য লাভ হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সমাজ মধ্যে যোগ্য ও কৃতিগণের অপত্য, অযোগ্যগণের অপেক্ষা অনুপাতে অনেক অধিক জাত হওয়া ও জীবিত থাকা অত্যাবশ্যক।

কর্ম্ম।

যোগ্যাযোগের পরিচয় কর্ম্মে। কর্ম্ম বংশানুগত নহে; কিন্তু যেরূপ দেহ ও মন দ্বারা ঐ কর্ম্ম পূর্ব্ব পুরুষগণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দেহ ও মন পরবংশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ কর্ম্ম অথবা উহার অনুরূপ কর্ম্ম, কিম্বা ঐ

* Essays in Eugenics.

দেহ ও মন হইতে যেরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই পরবংশীয় ব্যক্তি করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্মের প্রবণতা, কর্ম্মের উপযোগীতা পূর্ব্ব পুরুষ হইতে অবগত হয়; কর্ম্ম আগত হইতেও পারে, নাও পারে। আমি একজন বিখ্যাত ডাকাইতের নাম শুনিয়াছিলাম; তাঁহার পুত্র ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করতঃ বিচার বিভাগে কার্য্য পাইয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ লইয়া বিচার করিতেন। তাঁহার পিতার দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডল ও দুর্ব্বল মস্তিষ্ক পরধন লাভের প্রলোভন সংযত কবিতে পাবেন নাই; তাই তিনি ডাকাইত ছিলেন। পুত্রও তদ্রূপ দুর্ব্বল স্নায়ু সংস্থান লাভ করায় প্রলোভন জয় করিতে অসমর্থ ছিলেন। তিনি উৎকোচ গ্রাহী হইয়া ছিলেন, ডাকাইত হন নাই।

বংশানুক্রমের পরিমাণ।

এইরূপে বংশানুক্রমের প্রভাব নানাদিক হইতে লক্ষিত হইয়া থাকে। দেহ ও মন দুই-ই বংশানুগত। তবে যাহাকে sport অর্থাৎ প্রকৃতির অদ্ভুত খেলা বলা যায়, তদ্রূপ আকস্মিক ব্যতিক্রম কখন কখন না হয়, তাহা নহে। যাহা হউক পিয়ার্সন দেখাইয়াছিলেন যে মোটামোটি পুত্র পিতার লক্ষণ অর্দ্ধ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়; পিতামহের লক্ষণ পৌত্র $\frac{১}{২} \times \frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়; প্রপিতামহের লক্ষণ প্র-পৌত্র $\frac{১}{৩} \times \frac{৩}{৫} = \frac{১}{৫}$ এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হয়।* এইরূপে ক্রমে ঊর্দ্ধতন পুরুষে বংশানুক্রমের প্রভাব কমিয়া যায়। কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা সত্য হইতে পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু বহু ব্যক্তির গড় সম্বন্ধে ইহা সত্য হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

* National life P. 93.

উন্নতির উপায়।

এক্ষণে বিবেচনা করুন, কোন বহুসংখ্যক ব্যক্তিসমষ্টিকে অর্থাৎ কোন জাতিকে উন্নত করিতে হইলে পরবংশ কিরূপে গঠিত করিতে হইবে? যোগ্যবংশীয় নরনারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যোগ্যতা বংশানুগত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং যোগ্যবংশীয় নরনারীকে বিবাহিত করিতে পারিলে পরবংশও যোগ্য হইবে। বিবাহযোগ্য প্রাপ্ত-বয়স্ক যুবক যুবতীর যোগ্যতা কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বুঝিবার উপায় কি? ইহা না বুঝিতে পারিলে শুধু বংশগুণে যোগ্যতার সম্ভাবনা দেখিয়াই বিবাহ দিতে হয়। কিন্তু এরূপ করা অপেক্ষা প্রত্যেক যুবক যুবতীর বাল্যাবস্থা হইতে যোগ্যতার লক্ষণ সকল লিপিবদ্ধ থাকিলে তদ্দৃষ্টে অধিক নিশ্চয়তার আশা করা যায়। অভিভাবকগণ অথবা স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ যদ্যপি প্রত্যেক বালক বালিকার স্বাস্থ্য, একাগ্রতা, ধীরতা, সাহস, উদ্যম এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির খাতা রাখেন, তবে তাহাদিগের যোগ্যতার অথবা অযোগ্যতার উত্তম রূপ অনুসন্ধান হইতে পারে। এই রূপে কর্ম্মচারিগণের প্রভুগণ যদ্যপি ঐরূপ খাতা রাখেন, তাহা হইতেও যোগ্যাযোগ্যের বিচার হইতে পারে। পূর্ব্ব কালের ঘটকগণের ন্যায় বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ যদ্যপি যোগ্যবংশের এবং যোগ্য বালক বালিকা, যুবক যুবতীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করেন, তবে পরবংশ সুযোগ্যভাবে গঠিত করিবার নিমিত্ত বিবাহ সময়ে ঐ সকল খাতা ও পুস্তক দৃষ্টে অনেক উপকার হইতে পারে। সুপ্রজনন কল্পে ইহাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যোগ্যবংশের একবিন্দু রক্ত পাইয়া আমার পরিচিত চারিটী অযোগ্য বংশে উত্তম সন্তান লাভ হইয়াছে; তদ্দ্বারা সে চারিটী বংশ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহাদিগের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে না।

পরবংশ।

উত্তম অপত্য লাভ করিতে হইলে সুস্থ, ধীর, সাহসী, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক বংশীয় তদ্রূপ ব্যক্তিগণের দ্বারাই পরবংশের অধিকাংশ গঠিত হওয়া উচিত। রুগ্ন, ভীরু, অধীর, নির্ব্বোধ ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরবংশ গঠিত হওয়া উচিত নহে। এ সকল পতিত ব্যক্তিগণের সন্তান উৎপাদন সম্পূর্ণ রূপে নিবারণ করা সম্ভব নহে; তথাপিও যতদূর পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়েও ক্ষয়কাশিগ্রস্ত, উন্মাদ, জড়, মূক, নির্ব্বোধ, কুষ্ঠী, মদ্যপ, রাজদ্বারে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত কেহই পুত্র অথবা কন্যা বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ তদ্রূপ পিতামাতা অপত্যগণেও দূষিত করিবে, বলিয়া গুরুতর আশঙ্কা হইয়া থাকে।

যেমন সভাবতঃই ঈদৃশ বর অথবা কন্যা সকলেই বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তেমনই অন্যান্য প্রকারেও যোগ্যাযোগ্যের বিচার করিয়া বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেই ক্রমে পরবংশ নানা দোষে দুষ্ট হইবে না বরং নানা গুণের অধিকারী হইবে। একটা জার্ম্মান রমণীর কথা নানা গ্রন্থে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সে চোর ও মাতাল ছিল, যেখানে সেখানে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে ৭০৯ ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষ থাকা জানা গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১০৬ জন জারজ, ১৪২ জন ভবঘুরে ও ভিক্ষুক, ১৮০ জন বেশ্যা, ৭ জন নরহন্তা, ৭৬ জন দাসী ছিল, একজন অযোগ্য হইতে কত অযোগ্য জাত হইতে পারে, এই নারী তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। গত আদম সুমারি হইতে জানা যায়, এতদ্দেশে উন্মাদের সংখ্যা ১৯,৯৭৮, মূক বধিরের ৩২,১২৫; অন্ধের ৩২,৭৪৭; কুষ্ঠ রোগীর ১৭,৪৮৫; ইহাদিগের সমষ্টি ১,১৯,৬৮১; মোটামোটি এক

লক্ষ বলা যাউক। এক্ষণে বিবেচনা করুন, অন্ধতা—ভিন্ন অপর তিনটী পীড়ার দুইটী বংশানুগত ও, একটী সংক্রামক। ঐ দুই শ্রেণীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি বিবাহ করিলে শত বৎসর মধ্যে ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কত অপত্য জাত হইতে ও জীবিত থাকিতে পারে। তাহাদিগের সংখ্যা অন্য উপায়ে হ্রাস করিতে পারিলেও মোটের উপর নগণ্য হইবে না। এইরূপে এই সকল অযোগ্যের দ্বারা সমাজের যে অংশ গঠিত হইবে, তাহা কত অযোগ্য কত অধঃপতিত। অন্ধ মূক, বধির ইত্যাদিকে এক্ষণে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত বহুবিধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা তাহাদিগের পক্ষে কল্যাণকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ন্যূনাধিক উপার্জ্জনক্ষম হইলেই এ দেশে উহাদিগের বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়া যাইবে। উহাদিগের অপত্য হইলে তিন চারি পুরুষের মধ্যেই সমাজের যে ভীষণ অবস্থা হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না। যে কোনও প্রকারে অযোগ্যের বিবাহ করা সহজ হয়, এবং সুযোগ্যের কঠিন হয় তাহাই দূষণীয়। রাজনীতিক কারণে কখন কখন অযোগ্যের ভাগ্যে উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে। তাহাতে উহাদিগের বিবাহ করার ও পরবংশকে যোগ্যতায় হীন করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এরূপ করা সঙ্গত নহে। যাক্ এক্ষণে আমাদিগকে পরবংশ উন্নত করিতে হইবে। প্রশ্ন ছিল, তাহার উপায় কি? জীব-বিজ্ঞানের সুপ্রজননতত্ত্ব ইহার কি উপায় ইঙ্গিত করে? আমি "নির্দ্দেশ করে", বলিতেছিলাম; কিন্তু এ শাস্ত্রের এখনও এরূপ অবস্থা হয় নাই যে, "নির্দ্দেশ" করিতে পারে; ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই বর্ত্তমানে ইহার তুষ্ট হওয়া উচিত। আরও বহু অনুসন্ধান বাকী আছে। সৌভাগ্যক্রমে এ শাস্ত্রের অনুশীলন ও মৌলিক গবেষণা প্রায় সকলেই করিতে পারেন। ইহার উপাদান মানুষ; যন্ত্রাগার, পথ, ঘাট, মাঠ, বাড়ী, গ্রাম, সহর সর্ব্বত্র বিস্তৃত।

জাতীয় উন্নতির ইচ্ছা প্রবল হইলে একটু ক্লেশ স্বীকার করিলেই বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

পরবংশ গঠন

আমাদিগের, প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে দেখিতে হইবে, কিরূপে সমাজে সু-সন্তান অধিক জাত হয়। একমাত্র উপায়ই, বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করা। (১) বংশানুক্রমিক অথবা দুরারোগ্য অথবা সংক্রামক পীড়াতে যাঁহারা পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহারা (যথাসাধ্য) সন্তান উৎপাদনে বিরত থাকিবেন। (২) ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র প্রভৃতি জননশক্তির ক্ষতিকর পীড়া; ব্যভিচার, বিলাসিতা, অতিরিক্ত মদ্যপান, অহিফেন, গাঁজা ইত্যাদি সেবন, জননশক্তির ক্ষতিকর দোষ। যাহারা এই সকল জননশক্তির ক্ষতিকর পীড়াগ্রস্ত কিম্বা তদ্রূপ দোষদুষ্ট, তাহাদিগের অপত্যকে অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে ও বেশি যোগ্য দ্বারা ব্যবহার শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। নচেৎ সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। মদ্য, অহিফেন ইত্যাদি এত তীব্র ও স্থায়ী বিষ যে শুক্র শোণিতকে নষ্ট অথবা বিকৃত করিয়া অপত্যগণকে বিকলাঙ্গ অথবা বিকৃতমনা করিতে পারে; অনেক স্থলে অতিমাত্র সেবনে জনন-হীনতাই ঘটাইয়া তুলে। এসকল পীড়িত, এসকল দোষে দুষ্ট ব্যক্তি-গণের অপত্য দেহে ও মনে দূষিত হওয়া সম্ভব। সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর করা অসাধ্য; তথাপি শিশুকাল হইতে অতি সাবধানে ও বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে লালনপালন করিলে জন্মগত কুফলের বাহ্য বিকাশ কিয়দংশে দমন করা যাইতে পারে। ঐ সকল ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা সম্ভব নহে এবং বোধ হয় মোটের উপর সঙ্গতও নহে। (৩) যাহারা সুস্থ, সচ্চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, এরূপ নরনারী দ্বারা

পরবংশের অধিকাংশ গঠিত হওয়া জাতীয় উন্নতি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ ব্যক্তিগণ যদ্যপি নিঃস্ব অথবা অর্থহীন থাকেন তবে সমাজ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া বিবাহকার্য্যে সহায়তা করিবেন। এস্থলে সমাজ শব্দ দ্বারা আমি রাজাকেই ইঙ্গিত করিলাম। নচেৎ দেশমধ্যে গুণীর সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইবে। (৪) যাহাদিগের জননশক্তি পুরুষানুক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ নরনারী বর্জ্জনীয়। বিবাহযোগ্য নরনারীর দোষগুণ এই ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেই প্রচুর হয় না। বর কন্যার বয়স, বিবাহের প্রণালী, বিহাহক্ষেত্র ইত্যাদিও বিবেচনা করা আবশ্যক। বয়স সম্বন্ধে বহু কাল হইতে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। এতদ্দেশে পুরাকালে কথন কথন যুবক-যুবতীর বিবাহ হইত; কথন বা নিতান্ত বালক-বালিকার বিবাহ হইত। এখনও হয়। স্মৃতি শাস্ত্র অথবা আয়ুর্ব্বেদের নির্দ্ধারণ এ স্থলে উল্লেখ না করিয়াও শুধু জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে এই সকল মতের একটী মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ তাহাও করিয়াছেন। সে চেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছে, জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে, সকল সমাজের পক্ষে সকল সময়ে একরূপ নিয়ম সঙ্গত হইতে পারে না।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ।

যে সমাজে আরও অধিক জনবল চাই, সে সমাজে বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহু বিবাহ ইত্যাদি প্রচলন করা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু যে সমাজে জনসংখ্যা অধিক, সে সমাজে ঐ সকল কার্য্য অসঙ্গত বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে বহু ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরবংশ

গঠন করিবার এবং বংশপরম্পরা উন্নত করিবার যোগ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের অভাবে পরবংশ কে গঠিত করিবে? যাহারা ভীরু, দুর্ব্বল, যাহাদিগের দেশ-প্রীতি নাই সৎসাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাই, বুদ্ধি-বল ও জ্ঞান-বল নাই; অন্ধ, খঞ্জ, জড়, পীড়াগ্রস্ত তাহারাই পরবংশ গঠিত করিবে। সুতরাং দুই তিন পুরুষে ইউরোপ অধঃপতিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যেমন হিন্দু জাতির অধঃপতন হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর ইউরোপেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত। এক্ষণে বিবেচকগণ ঐ সকল মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা না করিলে আর রক্ষার উপায় দেখা যায় না। যে সকল অল্প সংখ্যক গুণী ও যোগ্য ব্যক্তি দেশের প্রয়োজনানুরোধে অথবা অন্য কারণে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগর অথবা তাঁহাদিগের নিকট-বংশীয় ব্যক্তিগণের বহু অপত্য জন্মদান করা এ স্থলে বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বহুবিবাহ দ্বারা এই দেশ-হিতকর উদ্দেশ্য যেমন সিদ্ধ হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। তৎপর ঈদৃশ অবস্থায় বাল্যবিবাহও নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। নারীগণের ১৩।১৪।১৫ বৎসরের বয়স হইতে ৪০।৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত অপত্য জন্মিলে অধিক সংখ্যক অপত্য জাত হইতে পারে। কিন্তু ২০।২৫।৩০ বৎসর হইতে ৪০।৪৫ বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হইলে, তত অধিক হয় না। যে সকল যুবতী ২০।২৫।৩০ বয়স হইতে সন্তান প্রসব আরম্ভ করেন, তাঁহারা ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে অন্ততঃ দশ বৎসর কাল সন্তান ধারণ যোগ্যা হইয়াও সন্তান ধারণ করেন না। ইহাতে সমাজে ভবিষ্যৎ বংশে লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। বিবাহ সত্য সত্যই পুত্রার্থে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। নিজের জন্য ব্যক্তিগত সুখের আশায় গৃহস্থ ধর্ম্ম নহে। বিবাহ প্রথার ইতিহাস যাহাই

হউক, উন্নত সমাজে ইহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, পরবংশ গঠন করিয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এ কল্যাণ একমাত্র বিবাহেরই সাধ্য। "যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সুতে তথাবিধং" সুপ্রজনন শাস্ত্র মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এই মহাবাক্যেরই ঝঙ্কার মাত্র। সুতরাং ভবিষ্যৎ বংশে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যদি বালিকা বিবাহ আবশ্যক হয়, তাহা করিতেই হইবে। ঈদৃশ বিবাহের অপত্য ক্ষীণ ধাতু হওয়া সম্ভব। তথাপি লোকক্ষয়, সুতরাং ক্রমে জাতীয় বিলোপ নিবৃত্ত করিতে হইলে বরং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তি জন্মাও বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। সার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন এই দিক হইতে বিষয়টীর আলোচনা করতঃ মীমাংসা করিতেছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন যুবতী বিবাহ জাতীয় বিলোপসাধক।

The general result is that group B gradually disappears and the group A more than supplants it. Hence if the races best fitted to occupy the land are encouraged to marry early, they will breed down the others in a very few generations. *

B শ্রেণী ২৯ বৎসর এবং A শ্রেণী ২০ বৎসর বয়স্কানারী।† এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহ জাতীয় বল-ক্ষয়কর; উহা কেবল সামাজিক প্রয়োজন বশতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা বাঞ্ছিত মত বৃদ্ধি হইয়া গেলে উহা আর অনুষ্ঠেয় নহে।

* Inquiries into human faculty 210.

† বিলাতের ২০ এবং ২৯ বৎসর বয়স্কা নারীর সহিত এদেশের ১৩।১৪ এবং ২১।২২ বৎসর বয়স্কা নারীর তুলনা করা যাইতে পারে।

সমাজের প্রয়োজন বশতঃ কখন বাল্যবিবাহ, কখন যৌবন-বিবাহ; অথবা এক সময়েই সমাজের বিভিন্ন অংশে এই দুই বিভিন্ন প্রথা অবলম্বিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেশ, কাল, ও অবস্থা বিবেচনায় সকল প্রথাই অবলম্বন ও পরিত্যাগ করা উচিত। সকল অবস্থায় একটী নির্দ্দিষ্ট বিধি গ্রহণীয় নহে। আমাদিগের দেশে জনসংখ্যা এখনও প্রচুর নহে। বঙ্গদেশীয় নানা জেলায় মোটের উপর দেখা যায় যে প্রতি বর্গ মাইলে ৩২৫ জন হইতে ৯২৫ জন ব্যক্তি বসবাস করে। ইহার গড় ধরিলে প্রতি বর্গ মাইলে ৫৬৭ লোকের বাস। বঙ্গের আয়তনের শতকরা ৭০ বিঘা আবাদযোগ্য; অবশিষ্ট এখনও আমরা চেষ্টা করিয়া আবাদযোগ্য করি নাই। পরিতাপের বিষয় এই যে, উল্লিখিত আবাদযোগ্য ভূমিরও অর্দ্ধেক মাত্র আমরা আবাদ করি (৪৯-৫); অপরার্দ্ধ আমরা আবাদ করি না। যদি আমরা দেশের বহু পতিত অথবা আবাদের অযোগ্য ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিতে জানিতাম; যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও গুণ বাড়াইতে পারিতাম; তবে আরও বহু লক্ষ্য ব্যক্তি জাত হইলেও খাদ্যের অভাব হইত না; অথচ সমাজের বলবৃদ্ধি হইত। একদিকে কত জমি পড়িয়া রহিয়াছে; এবং অন্যদিকে কত অবিবাহিত নর-নারী এবং বিপত্নীক পড়িয়া রহিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিলে গভীর পরিতাপের কারণ হয়। পুরাকালে সমাজ বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সমাজের অবস্থানুসারে পুনঃ পুনঃ স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এখন যেন আমরা জমিয়া যাইতেছি। অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারি না। যদিও চেষ্টা করি, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে চেষ্টা কমিয়া ধপ করিয়া নিবিয়া যায়। যাহা হউক, সমাজের প্রয়োজনানুসারে কখন বাল্যবিবাহ, কখন যৌবন-বিবাহ, কখন এক বিবাহ কখন বহু বিবাহ প্রচলিত থাকা আবশ্যক।

বিবাহের প্রণালী।

এক্ষণে বিবাহের প্রণালী ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত বোধ করি। বিবাহের প্রণালী দ্বিবিধ। নিজ দল, গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির মধ্যে কোনটীর অভ্যন্তরে, কোনটীর বহির্ভাগে এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিজ জাতি ও দলের মধ্যে; এবং নিজ গোষ্ঠী ও গোত্রের বাহিরে আমাদিগের বিবাহ করিতে হয়। বংশপরম্পরায় এই একমাত্র প্রণালীতে বিবাহ করিলে কতিপয় পুরুষ পরে দেহে ও মনে দুর্ব্বলতা আসে। নিজ দলের (অর্থাৎ মেল বা পঠির) মধ্যে, বহুকাল বিবাহকে সীমাবদ্ধ করিলে প্রায় একই প্রকার ধাতুর সংমিশ্রণে দীর্ঘকাল পরে জাতীয় চরিত্র বৈচিত্র্য-হীন হয়, বংশগত পীড়া বদ্ধমূল হইয়া বহু ভাবে প্রকাশিত হয়। জাতীয় চরিত্র "বৈচিত্র্য-হীন" হওয়া বড়ই কঠিন কথা। একই প্রকার অথবা প্রায় একই প্রকার ধাতু বংশানুক্রমে মিশ্রিত হইলে অপত্যে জড়তা আসে; উদ্ভাবনী শক্তি কমিয়া যায়; উদ্যম ও চেষ্টা ক্রমে লোপ হইয়া আসে। এ সকল জাতীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। নিজ দল মধ্যে বিবাহকে সীমাবদ্ধ করিলে জাতীয় চরিত্র একটী স্থায়ীভাব ধারণ করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে স্থায়ীভাব অর্থ জমিয়া যাওয়া। দেহের ও মনের স্থিতিস্থাপকতা গেলে, ব্যক্তি যখন জমাট বাধিয়া যায়, কেবল পুরাতন কর্ম্ম ও চিন্তা ব্যতীত, কেবল স্মৃতি মাত্র রোমন্থন ব্যতীত যখন আর তাহার কিছুই থাকে না, এক ভাবেই বসিয়া থাকে; তখন যে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও তাহাই হয়। একরূপ শুক্রশোণিত পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইতে হইতে কতিপয় বংশ পরে জাতির দেহ ও মন জমাট

বাধিয়া যায় অর্থাৎ জরাগ্রস্ত হয়; তখন তাহার পরিণাম বুঝিতে আর বাকী থাকে না।

পক্ষান্তরে, বংশপরম্পরায় নিজ দলের অথবা নিজ জাতির বহির্ভাগে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে থাকিলে ক্রমে অপত্যে সুতরাং সমাজ চরিত্রে একটা অস্থিরতা আসে; বহু নূতন পীড়া সমাজের দেহে ও মনে প্রবেশ করিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। সমাজ চরিত্রের অস্থিরতা ও বড় কঠিন কথা। নানা ভাবের শুক্রশোণিত সংমিশ্রিত হইতে হইতে দীর্ঘ কালে জাতীয় চরিত্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়; সে সমাজ এত অস্থির হইতে পারে যে, দ্রুত পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব হইয়া উঠে। ইহাতে পূর্ব্ব আচার অনুষ্ঠান নিয়ত ভাঙ্গিতে থাকে; গড়া অতি কম-ই হয়। এ অবস্থাও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। তথাপি এ স্থলে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বরং অস্থির হওয়া ভাল, তথাপি জমিয়া যাওয়া কিছু নহে। মানুষের সকল কার্য্যেই অপূর্ণতা; অমিশ্র মঙ্গল তাহার ভাগ্যে নাই। দলের গোষ্ঠীর অথবা গোত্রের ভিতরেও বিবাহ করা মঙ্গলজনক নহে, বাহিরেও নহে। দুই দিকেই জাতীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করা যাইতেছে। এখন মানব করে কি?

এস্থলেও বাল্য বিবাহ যৌবন বিবাহের সমস্যার ন্যায় হইয়া উঠিল। সমাজের প্রয়োজন বুঝিয়া কখনও বা দলের মধ্যে বিবাহ করতঃ জাতীয় চরিত্রে স্থায়িত্ব বিধান করা উচিত; কখনও বা দলের বাহিরে বিবাহ করতঃ সমাজ-দেহে নূতন রক্তের সহিত নূতন উত্তেজনা আনয়ন করা আবশ্যক *; অথবা এক সময়েই এই দ্বিবিধ প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলেও মোটের উপর মঙ্গলই আশা করা যায়। একের অমঙ্গল জনকত্ব অন্যের মঙ্গল জনকত্ব দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে। এই বিষয় বিশেষরূপে

* Heredity P. 537.

আলোচনা করতঃ অধ্যাপক টমসন বলেন "There seems much to be said for his (Reibmayn's) thessis that the establishment of a successful race or stock requires the alternation of priods of in-breeding (endogamy) in which characters are fixed, and priods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood, new variations are promoted." কিন্তু এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ বি-সম ধাতুর নর নারী বিবাহিত হইলে মঙ্গল জনক হইতে পারে; কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্ন ধাতুর নরনারীর অপত্য দেহে ও মনে অধম হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল মুলেটো, মেটে ফিরিঙ্গি ইত্যাদি।

পণ প্রথা।

বিবাহের প্রণালী বিবেচনা করিতে পণ দান প্রথা বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। এ বিষয়টী অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও সমাজ তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই প্রথা যে পরিমাণে অপত্যের অর্থাৎ পরবংশের দোষ গুণের সুতরাং জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত সংযুক্ত, সেই পরিমাণেই ইহার বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিব। ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে যে সকল উত্তম বর অথবা উত্তম কন্যা পরবংশ গঠন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য তাহাদিগের পিতা মাতার অথবা অন্য অভিভাবকের দারিদ্র্য বশতঃ বিবাহ হইতে না পারিলে সমাজ অনেক সু-সন্তান হইতে বঞ্চিত থাকে। উচ্চ জাতিতে কন্যার অভিভাবকের এবং নিম্ন জাতিতে বরের অভিভাবকের অস্থিচর্ম্ম অতিমাত্র চর্ব্বণ করাই অধুনা কুটুম্বিতার প্রধান লক্ষণ হইয়াছে। যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারাই অনেক ক্ষেত্রে অধিক লোভী দেখা যায়। যাহা হউক অর্থগৃধ্নু বরকর্ত্তা অথবা কন্যা-

কর্ত্তার উৎপীড়নে সুযোগ্যগণের বিবাহ তো অনেক সময় হইতেই পারে না; বরং রুগ্ন, বৃদ্ধ পাপীষ্ঠ ইত্যাদি অতি অযোগ্য বর কন্যাও বহুক্ষেত্রে বিবাহিত হয়। এরূপ হইলে সমাজ কখনই উন্নত থাকিতে পারে না; পতন নিশ্চিত। বিবাহ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থলোভ অল্পদিন হইল সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার অন্য যত কারণই থাকুক, আমার বিবেচনায় সমাজে দারিদ্র্য এবং বিলাসিতা বৃদ্ধি হওয়াই ইহার দুইটী গুরুতর কারণ। ইহাদিগের মধ্যে একটী কারণ (দারিদ্র্য) দমন করা দুঃসাধ্য; অপরটী (বিলাসিতা) দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও ক্রমেই যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। যাহাহউক এ সকল বিষয় আমার আর উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে পণ গ্রহণ প্রথা ক্রমে সমাজকে অধঃপতনের দিকে লইবেই। উত্তম বিবাহের বাধা জন্মাইয়া অপত্যের দেহে ও মনে দোষ রাশি সঞ্চয় করিবে; লোকক্ষয় করিবে; গুণীর সংখ্যাও হ্রাস করিবে;—"করিবে" বলি কেন? বর্ত্তমান কালেও বহুক্ষেত্রে করিতেছে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্ষেত্র।

বিবাহ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রধান কথাই এই যে ইহা যত সংকীর্ণ হইবে, ততই আমরা অযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইব। বহু বরের মধ্য হইতে যোগ্যকে বাছিয়া লওয়া কঠিন নহে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে বরের সংখ্যা কম, সেস্থলে অনন্যোপায় হইয়া অযোগ্যকেও লোকে কন্যাদান করিতে বাধ্য হয়। ইহার আর এক ফল পাত্রের মূল্য বৃদ্ধি। যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্যই বেশী হয়। যে দ্রব্য অনেক পাওয়া যায়, তাহার মূল্য তাদৃশ অধিক হয় না। একারণে বরপণ গ্রহণপ্রথা স্থায়ী হইয়া

উঠে। এতদ্দেশে যে সকল মেল ও গোষ্ঠী আছে, তদ্দ্বারা বিবাহ-ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা আমাদিগের জাতীয় অবনতি দ্রুতবেগে আনয়ন করিতেছে।

মেণ্ডেলের বিধান।

আমরা সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করাকেই জাতীয় উন্নতি অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহে যোগ্যাযোগ্য বিচারই মানুষ গড়িবার প্রধান, এমন কি, একমাত্র উপায়। বংশানুক্রমে বিধান অনুসারেই এই কার্য্য সিদ্ধ হয়। সেই বিধানের অন্তর্গত মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendle's law) নামক নিয়মানুসারে, অযোগ্যে ও সুযোগ্যে মিলন হইলেও তো অযোগ্যতা কালক্রমে দূরীভূত হইতে পারে। তবে আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত কথা সকল স্বীকার করা যায় কি প্রকারে? এরূপ আপত্তি উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। মেণ্ডেলের নিয়মানুসারে কোনও বংশপরম্পরায় অযোগ্যতা বৃদ্ধি হওয়াও অনিবার্য্য। মেণ্ডেলের বিধান সংক্ষেপে এই ঃ—দুইটী বিভিন্ন লক্ষণ-যুক্ত প্রাণী হইতে যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহাদিগের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ একটী লক্ষণ এবং অপর এক চতুর্থাংশ অন্য লক্ষণটী প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ অপত্য উভয় লক্ষণই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐ দুইটী লক্ষণ প্রথম পুরুষেই পৃথক হইয়া গেল; কিন্তু সে অপত্য সংখ্যার অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে। অপর অর্দ্ধাংশ সঙ্কর ভাবাপন্ন হইল। প্রথম অর্দ্ধাংশে যে দুইটী লক্ষণ যুক্ত প্রাণিগণ স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত প্রাণিগণের সহিত সংযুক্ত হইলে যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহারা বংশানুক্রমে স্ব স্ব লক্ষণ স্থায়ী ভাবে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রথম পুরুষে যে অর্দ্ধাংশ সঙ্কর ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহারাও

প্রথম পুরুষের ন্যায় $\frac{1}{4}$ এক লক্ষণ, অপর $\frac{1}{4}$ অন্য লক্ষণ, এবং অর্দ্ধাংশ উভয় লক্ষণযুক্ত সঙ্কর ভাবাপন্ন হয়। এই বিধান নিম্নে অক্ষর দ্বারা প্রদর্শিত হইতে :—ক, খ, দুইটী পৃথক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি ;

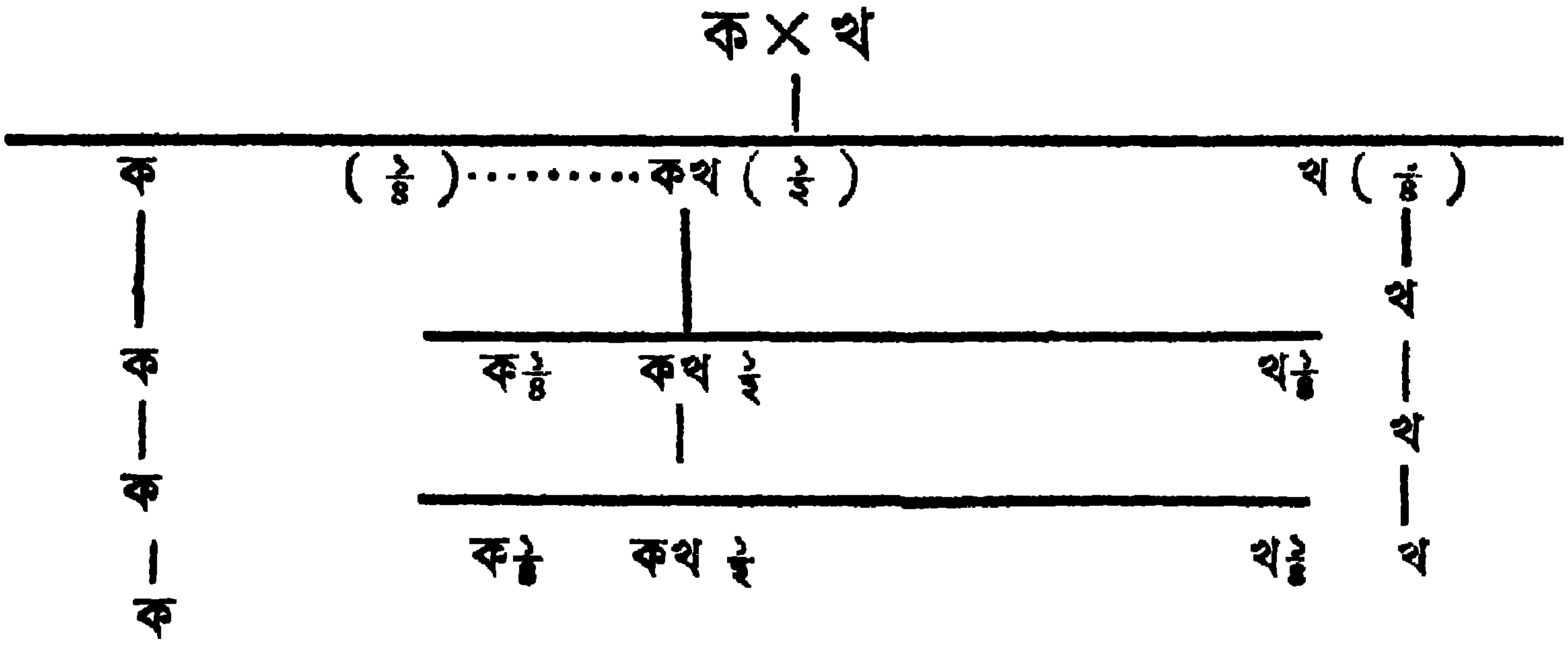

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; ক এবং খ, এই দুইটী পৃথক লক্ষণ যুক্ত জীব হইতে "ক" লক্ষণ (যুক্ত জীব) বংশানুক্রমে পৃথক হইয়া গেল ; খ লক্ষণও তাহাই হইল। আর ক, খ, লক্ষণ বংশানুক্রমে যুক্ত হইয়া গেল। ইহাদিগের অনুপাত ।০, ।০ র ॥০ মাত্র, সুতরাং অযোগ্য বংশে ।০ আনা যোগ্য অপত্য সম্ভব হইলেও তদপেক্ষা অনেক অধিক অযোগ্যের সম্ভাবনা হইতেছে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মেণ্ডেলের বিধান উদ্ভিদ সম্বন্ধে যেরূপ সুপ্রমাণিত হইয়াছে, জন্তু সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মানব সম্বন্ধে তদ্রূপ সুপ্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু নিত্যই জন্তু সম্বন্ধেও প্রমাণিত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতার মেটে ফিরিঙ্গি সমাজে অনুসন্ধান করিবার সময় আমার ধারণা হইয়াছে যে, মানব সম্বন্ধেও মেণ্ডেলের বিধান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। এতদ্দেশে আপনারা সকলেই এই বিধানটী সঙ্করগণ মধ্যে পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি একদিন দুইটী ফিরিঙ্গিকে

তাস খেলিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাদিগের মুখের আকৃতি দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, তাহারা দুইটী ভাই। কিন্তু এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, অপর জন গৌরবর্ণ; অনায়াসে খাঁটি শ্বেতসমাজে স্বজাতি বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি দুই ভাই?" (একটু ভয়ও মনে না হইয়াছিল, তাহা নহে) "আপনাদিগকে কি আমিও ভাই বলিয়া দাবি করিতে পারি?" উত্তরে সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদিগের মাতা ভারতীয় মহিলা।" এক্ষেত্রে আমি বিবেচনা করিলাম যে, মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ অপত্যে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আরও কয়েকটী ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি। আবার শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণের সংমিশ্রণে কটাবর্ণ অপত্য জাত হওয়া আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ণসম্বন্ধে পরীক্ষা করা যত সহজ হইয়াছিল, মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা তত সহজ নহে; বরং অত্যন্ত কঠিন। মানসিক দোষ গুণ পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি মেণ্ডেলের বিধানের সত্যাসত্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তথাপি এক কথা আমার একরূপ মোটামোটি ধারণা হইয়াছে যে পুত্র এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাবাপন্ন এবং কন্যা পিতৃভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও অনেক দেখিয়াছি। ফলতঃ অনেক অনুসন্ধানের ফল না দেখিয়া এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সঙ্গত নহে। এক্ষণে উপরের লিখিত সন্দেহের মীমাংসা হইতে পারে। অযোগ্যগণ হইতেও সুযোগ্য অপত্যলাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্য দিকে উহাদিগের সংমিশ্রণ হইতে বহুবংশে ধারাবাহিক রূপে অযোগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যায়। এবং যোগ্যাযোগ্যের সংমিশ্রণ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। বহু অপত্য হইলেই

সমাজ লাভবান হয় না; কথা হইতেছে এই যে, উহাদিগের মধ্যে কি পরিমাণ জীবিত থাকিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার যোগ্য, এবং কি পরিমাণে ফাঁসির কাঠে ঝুলিবার উপযুক্ত? শেষোক্ত অপত্যগণ যত ঝোলে ততই মঙ্গল। যাহা হউক, ইহাদিগের বিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে ইহাদিগকে যত কম গ্রহণ করা যায়, এবং যোগ্য ও যোগ্য-গণকে অথবা তদ্রূপ বংশীয়গণকে যত অধিক গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল।

এই একটী কার্য্য অর্থাৎ বিবাহ-সংস্কার বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে জানিলেই জাতীয় জন্মগত গুণ সকলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয়; নচেৎ মানবকে বংশপরম্পরায় উন্নত রাখা সম্ভব নহে। সুপ্রজনন-তত্ত্বের ইহা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মহাত্মা গ্যাল্টনের উপরি উদ্ধৃত সংজ্ঞা হইতেই বুঝা যাইতেছে "also those that developed the in born influences to the utmost advantage" অর্থাৎ ব্যক্তির জন্মগত গুণ সকলের এরূপভাবে বিকাশ সাধন করা উচিত যে জাতির কল্যাণকর হয়। ইহা প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়টী অতিশয় বৃহৎ এবং নানা ভাগে বিভক্ত। এস্থলে সে সকলের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে এই কথাটী না বলিয়া নীরব হইতে পারি না যে, যে শিক্ষায় ব্যক্তিকে তাহারা জাতীয় কর্ম্মের যোগ্যতা প্রদান করে না, পক্ষান্তরে প্রতিপদেই অপরের মুখাপেক্ষী করে, তাহা জাতীয় অধঃপতনের একটী প্রধান উপায়। একথা বিস্মৃত হইলে ব্যক্তিরও অধোগতি জাতিরও অধোগতি। আপনাদিগের মধ্যে অনেকের অনেক গুরুতর কথা বলিবার আছে; তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা বিশেষ ভাবে লাভবান হইব; সন্দেহ নাই। আমি আপনাদিগের আর অধিক সময় লইব না।

কিন্তু এ কথাটী বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিবই, জাতীয় উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইলে সদসৎ বিচার পূর্ব্বক বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করাই প্রধান কথা। এ কার্য্যে সজ্জন ও সদ্বংশের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতে হয়। ঈদৃশ আচরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা যে দেশে, যে সমাজে ও যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাকে ক্রমাবনতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ কর্ত্তব্যের অবহেলার ন্যায় মহাপাতক আর নাই। সাহিত্যের উন্নতিই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। বাঞ্ছিত পথে সাহিত্যকে পরিচালিত করা, বিচার পূর্ব্বক একাগ্র হইয়া সেই পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হওয়া ব্যতীত, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা করা যায় না। তুচ্ছ সাহিত্যিক ক্রীড়া লইয়া আর সময় ক্ষেপণ করা চলে না। শূন্য হস্তের করতালি লাভ করা সহজ হইতে পারে ; কিন্তু সাধনা যথাযোগ্য মানবকে লাভ করা ; মানুষের দেহ ও মন বর্ত্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যৎ আশার উপযোগী করা, এবং সমাজের ও দেশের কল্যাণ সাধনের যোগ্য করা। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে না জানিয়া পুরাকালে কত জীব মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজি তাহাদিগের কঙ্কালমাত্র ধরা-গর্ভে পড়িয়া রহিয়াছে, সে অস্থিপুঞ্জ নীরবে কি মহা শিক্ষাই দিতেছে! কত বিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াও, মানুষ গড়িতে না জানায়, বিচার পূর্ব্বক বিবাহ করিতে না জানায়, কত সমাজ পুরাকালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অবহেলা না করি। মানবকে বেষ্টনীর উপর জয়ী হইবার মূলমন্ত্র। সে মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে প্রকৃত কি উপায়ে মানবকে ধনে জনে ন্যায়ে ও সামর্থ্যে বড় করেন, আবার কোন উপায়ে তাহাকে অধঃপতিত করেন, এ সকল গভীর গবেষণা দ্বারা অবগত হইতেই হইবে। এ মন্ত্র লাভ করা ভিন্ন

জাতীয় মৃত্যু নিবৃত্ত হইবার নহে। জাতীয় জড়তা এবং জনহীনতা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ;—এ সকল বিনাকারণে হয় না। সেই কারণ পরম্পরা জ্ঞাত হইলেই উহার প্রতিকার করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়; তখন সৎসাহস অবলম্বন করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই জাতীয় জীবন রক্ষা করিবার আশা করা যায়। এ বিষয় এস্থলে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। তথাপিও যদি আমি এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আপনাদিগের মধ্য হইতে কাহারও হৃদয়ে মানবতত্ত্ব আলোচনার স্পৃহা আরও প্রবলভাবে জাগ্রত করিয়া দিতে সক্ষম হই, আমার এই জ্ঞান-গৌরব মণ্ডিত দেশে আবার যদি আয়াস সাধ্য মৌলিক জ্ঞানানুসন্ধানের প্রতিজ্ঞা উন্নতশিরে আত্মপ্রকাশ করে, তবেই আমাদিগের এই সাহিত্য-সম্মিলন সফল হয়, আমরাও কৃতার্থ হই; নচেৎ আমরা

"পরি দীপমালা নগরে নগরে,
মোরা যে তিমিরে, মোরা সে তিমিরে।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—দশম অধিবেশন

বাঁকিপুর

কার্য্যবিবরণী

প্রথম দিন

৯ই পৌষ ১৩২৩, ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৬, রবিবার

স্থান—পার্শী রিপন থিয়েটার

সভাপতি—সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, কে টি, এম্ এ, ডি এল্, ডি এসসি, সি এস্ আই ইত্যাদি

১। গত বর্ষের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহাশয়-রচিত নিম্নলিখিত আবাহন সঙ্গীত স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক গীত হয়

স্বাগত সারদা-সেবক বৃন্দ বঙ্গরতন সার !
অঞ্জলি দিতে এস লয়ে সবে হৃদয়-অর্ঘ্যভার !
দূরদেশে আজি এ মহাবোধন,
দীনের কুটীরে হীন আয়োজন,
পূজিতে ভারতী শুধু আকিঞ্চন—
সম্বল নাহি আর।
উজ্জ্বল তবু প্রবাস ভবন,
পূর্ণ মোদের শূন্য জীবন,
সুপ্ত-হৃদয় ভক্ত-চরণ
পরশি' উথলে ধার।
সুধা নির্ঝর জননীর ভাব
ঢালিয়া শ্রবণে মিটাও তিয়াষ ;
প্রতিভা-কিরণে কর পরকাশ
বাণী-মন্দির দ্বার।

যেখানে তোমরা ফেলিছ চরণ—
পাটলিপুত্র, পূত,-পুরাতন,
স্মৃতির শ্মশান, তিমির মগন,
আজি সে ভস্মাগার।
ছিল, ধন জ্ঞান বীর্য্যের বলে
রতনের হার ভারতের গলে;
এবে অনাদৃত নিভৃত অতলে
নেহার সমাধি তার।
এ হেন তীর্থে বাণী-বন্দনা
হবে কি সফল জীবন সাধনা?
ধন্য হইব পদরেণু-কণা
ধরিয়া হৃদয়ে মা'র?

২। নবম সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সভার উদ্বোধন করিলেন সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সহানুভূতিসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করা হইল।

৩। মান্যবর মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি, দিনাজপুরাধিপতি, মান্যবর স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, মান্যবর স্যার আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজা মণিলাল সিংহ, হেতমপুরের মহারাজকুমার, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

৪। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত নিম্নলিখিত 'বিহার-মঙ্গল' সঙ্গীত স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক গীত হয়।

বিহার মঙ্গল।

(১)

পড়িল যে দেশে জ্ঞান গরিমার প্রথম অরুণ আলোক কর,
যে দেশের বন, তপোবন আর ঋষি আশ্রম অবনীপর,
ভারত যাদের কীর্ত্তিমুখর—এ মহাভার বিশ্ব মাঝ,
এস ভগবতি কল্যাণময়ি, তোমার সে আদি নিবাসে আজ।

কোরাস্

বঙ্গ ভারতী গঙ্গা আসিছে, শঙ্খ বাজাও পৌরজন
বাঙালী সগরবংশ-ভস্মে দানিতে মৃত্যু সঞ্জীবন।

(২)

বিদেহ এখন সঁপি দেহভার যুক্ত বিহার নিজের করি,
রচিছে মায়ার মোহন মালিকা নির্ম্মাল্যেরি গন্ধেভরি !
আসন এ তব পুরাণ বেদীতে অটল রাখ মা করুণাবতি,
চিত সিতাব্জ সন্নিষণ্ণা, সুপ্রসন্না সরস্বতী।

(৩)

হেথা মিথিলার জনমিল, নৃপ ঋষি আদর্শ জনক রাজ,
নন্দিনী রূপে ইন্দিরা উরে যার হলমুখে ক্ষেত্র মাঝ,
যে রাজসভায় মৈত্রেয়ী আর গার্গী শুনাত ব্রহ্মজ্ঞান,
পুরোহিত যার উদ্দালক ও অশ্বল আদি মনীষাবান্।

(৪)

মহারাজর্ষি ভরত এ ভূমে মুগ্ধ হরিণ শিশুর স্নেহে,
পেল অহল্যা পাবন চরণ পরশে জীবন পাষাণ দেহে,
যে রাম সীতার কীর্ত্তি কহিতে স্ফুরিল প্রথম ছন্দ গান,
যে গীতের গাতা কবিগুরু আজি-এ সে রামসীতা মিলনস্থান।

(৫)

যে দেশের বনে হইল প্রথম প্রচারিত ভবে তত্ত্বজ্ঞান,
দর্শন ন্যায় সভ্যতা বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রব্যাখ্যান,
জ্বালি হোমাগ্নি লভিল সিদ্ধি বিশ্বামিত্র সে বনমাঝে,
যাজ্ঞ্যবল্ক বিরচিল নব বেদের সূক্ত বিশ্ব কাজে।

(৬)

মহা মহর্ষি জৈমিনী আর কপিল যে ভূমি পবিত্রিল,
গৌতম ঋষি জ্ঞান শলাকায় নব দর্শন খুলিয়া দিল,
যেথা নারায়ণ স্বয়ম্প্রকাশ চরণ রাখিয়া অসুরশিরে,
করেন বিধান অমৃত নিদান অগতির গতি ফল্গুতীরে।

(৭)

মহাভারতের দুর্জ্জন রাজা জরাসন্ধের প্রাসাদশেষ
যে রাজগৃহেরে এখনো বক্ষে ধরিয়া রেখেছে এ মহাদেশ।
ভুলেনি সে ভূমি এখনো কুমার বোহিতাশ্বের শৌর্য্যগাথা,
এখনও সে গড় পর্ব্বতরাজি গর্ব্বে তুলিছে উচ্চ মাথা।

(৮)

আরেক কুমার আসিল যথায় কৌপীন সার শ্রমণ ত্যাগী,
"মা মা হিংসীঃ" ঋতম্ভরার নবঋক্ রচি নরের লাগি,
ভিক্ষা করিয়া দুয়ারে দুয়ারে, রক্ষা করিল জীবের প্রাণ,
শিল্পকলায় কাব্য গাথায় বহাইল দেশে নূতন বান।

(৯)

দেখিতে দেখিতে ভরি গেল দেশ বিহার সঙ্ঘে হাজার মঠে,
পৌঁছিল বাণী যাঁর, মুখে মুখে বিশ্ব মানব মর্ম্মতটে,
তরি গিরি দরী মরু প্রান্তর পল্লী নগর সাগর বন
ঘোষিল মর্ত্ত্যে অমৃত বার্ত্তা আশ্বাস বাণী চিরন্তন।

(১০)

বিহার হেথায় ছিল বনে বনে, "বিহার" সে হেতু দেশের নাম
সুগত যেথায় হইল বুদ্ধ, সিদ্ধ সকল মনস্কাম—
"পত্তন" হল বিশাল রাজ্য, "পাটলিপুত্র" নগর এ সে,
ধনে বাণিজ্যে সভ্যতা জ্ঞানে হ'ল আদর্শ সকল দেশে।

(১১)

অন্নপূর্ণা হইয়া ভারতী হরিতে বিশ্ব বুভুক্ষায়
খুলিলা যেথায় জ্ঞানের সত্র, বিক্রমশিলায় নালন্দায়!
দেশ দেশান্ত হইতে আসিয়া ছুটেছিল দ্বারে অতিথি যার,
বন্দি তোমায় জগৎ-হ্লাদিনী সেই মহাভূমি নমস্কার।

(১২)

মগধ নরেশ চন্দ্রগুপ্ত যেথা মা'র নামে রাজাপাতি
গ্রীস ভারতের বাঁধি দু'টি পাণি মিলাইয়া দিল দু'মহাজাতি,
অতুল কুটিল নীতি বিশারদ দ্বিজ চাণক্য রাজসচিব
দেখাইল যেথা ব্রাহ্মণ কত শক্তি ধরে যে অপার্থিব।

(১৩)

ভূপতি অশোক পালিল যে দেশ সেবা সুনীতিতে প্রভুর নামে
চৈত্য পান্থপাদপে হরিল পথিকের তাপ পথে ও গ্রামে,
শিল্প লক্ষ্মী ছড়াইয়া দিল কুসুম পুঞ্জ জগৎময়
অতীত অন্ধ আঁধারে স্তব্ধ জগৎ ধ্বনিল "মগধ জয়"।

(১৪)

হেথায় নন্দ মৌর্য্য গুপ্ত বঙ্গের সেন পালজ রাজ
মোগল পাঠান কত না রাজ্য ভাঙিল গড়িল এ ভূমি মাঝ
ছায়া সুশীতল সরণি নির্ম্মি, শেরশার হেথা সমাধি শেষ,
পঞ্চনদের ফিরাল যে স্রোত গুরুগোবিন্দ-প্রসূ এ দেশ।

(১৫)

এ বন নগরী মুখরি কুহরি সুপদলহরী বিদ্যাপতি
তুলিয়া সেদিন করেছে বঙ্গে বিহার হিয়ার নিকট অতি
স্বাগত বঙ্গ কোকিল কোবিদ্ বাণী পুরোহিত সাধক ধ্যাতা
স্বাগত এ পুর পাটলিপুত্রে—এ যে জগতের তীর্থ মাতা।

৫। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-রচিত "বাণী-বন্দনা" নামক সংস্কৃত কবিতা—"দরিদ্র্য সাহিত্যিকস্নুবৃন্দৈঃ"—ইত্যাদি পাঠ।

৬। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম এ, বি এল, মহাশয় কর্ত্তৃক অভিভাষণ পাঠ। (ইহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।)

৭। শ্রীমতী মানকুমারী বসু মহোদয়ার নিম্নলিখিত "সরস্বতী-স্তোত্র" নামক কবিতা পাঠ। পাঠক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত।

১

নমো নমো ভকত-বৎসলা
নমো দেবারাধ্যা দেবী বাণি!
নমো মাতঃ জগদ্ধাত্রী, চতুঃষষ্ঠী বিদ্যাদাত্রী,
নমো শ্বেত পদ্মাসনা
নমো বীণাপাণি!

২

যুগে যুগে নিখিল জগতে
সবে অই পাদ পদ্ম পূজে;
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নরাদি লক্ষ লক্ষ,
নিত্য দেয় পুষ্পাঞ্জলি,
ও চরণাম্বুজে।

৩

নর নারী দু'দিনের তরে,
তথাপি মা, তব কৃপা-বলে,
ভুলিয়া মরণ-ব্যথা, লভে চির অমরতা—
রবি শশী সহ রহে
জাগি ভূমণ্ডলে।—

৪

শুনিয়াছি—দস্যু রত্নাকর,
দুরাচার পাপী দুরাশয়,
তুই সেই পাপ পিষি', করিলে "বাল্মীকি ঋষি,"
সে রচিল রামায়ণ
চিরামৃতময়!

৫

শুনিয়াছি—মূর্খ কালিদাস
ঘরে পরে উপহসনীয়,
তোমারি করুণা জন্য, মরতে হইল ধন্য,
সে অমর কবিবর
বিশ্ব-বরণীয়!

৬

শুনিয়াছি—সে ক্রমদীশ্বর
বিদ্যালয়ে "অকৃতী অধম"
তুমি তারে দয়াময়ি, করি দিলে বিশ্বজয়ী,
দিলে তারে স্মৃতি, মেধা,
অজেয় বিক্রম!

৭

শুনিয়াছি—বঙ্গ জননীর
পুত্র ছিল শ্রীমধুসূদন—
জানিত না বঙ্গভাষা, তুমি মা পূরালে আশা,
কবিকুল-রবি তারে
হেরিল ভুবন !

৮

শুনিয়াছি—সে মধু কিন্নর,
কাঙাল, রসিক সুভাজন,
আরো কত অশিক্ষিতে, তুমি যে দয়ার্দ্র চিত্তে
করিলে দেশের রত্ন—
দরিদ্রের ধন।

৯

শুনিয়াছি—পুণ্য মিথিলায়,
জনকের ধর্ম্ম সভা-মাঝে,
শুক্ল ঋষি শাস্ত্রদর্শী, যবে জ্ঞানামৃত বর্ষি
দাঁড়াইত সুলভাদি
গার্গী পূত সাজে।

১০

শুনিয়াছি—কন্যারত্ন কত
পাঠাইলে ভারতে, ভারতি !
রচিলা বেদের সূক্ত, "থেরী গাথা" হ'ল উক্ত,
জ্যোতিষ গণিতে দীপ্তা
খনা, লীলাবতী।

১১

শুনিয়াছি—দরিদ্র কুটীরে
দীনা ক্ষীণা বঙ্গভূমি-বুকে,
জ্ঞানহীনা কত মেয়ে, তোমারি মমতা পেয়ে,
গাহিল অপূর্ব্ব গীতি
মধু মাখা মুখে।

১২

ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছায়,
মূক বক্তা পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি,
কে না চাহে হেন দেবী, জনমে জনমে সেবি,
কে না চাহে, পা' দুখানি
রাখি বুক চিরি?

১৩

আজি এই সুধী-সম্মিলন
এ যে শুধু মা, তোমারি পূজা,
তব প্রিয় সুত সবে, তোমার মহিমা স্তবে,
সঁপিয়াছে প্রাণ মন,
ও মা শ্বেতভুজা।

১৪

তব বরপুত্র আশুতোষ
বঙ্গের মাণিক্য কোহিনূর,
যাঁরে পেয়ে অভাগিনী, জগতের আদরিণী
যাঁরে হেরি পরিতৃপ্ত
দৃপ্ত বাঁকিপুর।—

১৫

আরো কত যোগ্য পুত্র তব
পূজারী এ ভকতি-মন্দিরে,
শিশু যবে ডা'কে মারে, কবে মা থাকিতে পারে,
সর্ব্ব সিদ্ধি লভে সে যে
নয়নের নীরে!

১৬

তাই ডাকি এস দয়াময়ি!
এস দেবারাধ্যা দেবী বাণি!
নমো মাতঃ জগদ্ধাত্রি! বিদ্যা, শুভ, বরদাত্রী,
নমো সর্ব্ব সিদ্ধিদাত্রী
নমো বীণাপাণি।

৮। সভাপতি-বরণ—প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ বি-এল, সমর্থক—মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে. সে. আই. ই, অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ বি-এল।

৯। মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় তাঁহার গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন।

১০। সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন (ইহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।)

১১। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ, মহাশয় কর্ত্তৃক গত বর্ষের যশোহর সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্.:আর্. এ. এস্ মহাশয় লিখিত নিম্নোক্ত 'বন্দনা' নামক কবিতা পাঠ—

১

পূজিতে বাণীর চরণ-কমল ভক্ত-পূজারী বেশে,
স্বাগত বঙ্গ-মনীষিবৃন্দ, আজি এ সুদূর দেশে।
মঙ্গল দিনে পুণ্য-লগনে মিল' গো সকলে আসি,'—
ফুটুক্ আজিকে অধরে অধরে 'মিলন-মধুর হাসি'।
নন্দিত করি' মন্দিরখানি গাও বীণাপাণি-জয়,
গম্ভীর ধ্বনি ওঙ্কার-সম ছুটুক্ নিখিলময়!
জ্বালাও আজিকে সত্য-আলোক মুছিয়া মোহের কালি
নিভাও আজিকে হিংসা-অনল শান্তি-সলিল ঢালি'।
স্নেহের শুভ্র তিলক পরিয়া কর সবে কোলাকুলি,
ধনী দরিদ্র মহৎ ক্ষুদ্র, বৃথা অভিমান ভুলি'!
জননী-আশিস্ লভিয়া শীর্ষে হওগো ধন্য ভবে,—
করহ ঘোষণা মায়ের মহিমা বিশ্ব ভরিয়া সবে।
সার্থক হ'ক্ এ মহামিলন স্বার্থকে দিয়ে বলি,
প্রেম-মত্ত হউক চিত্ত দম্ভ দীনতা দলি'!

২

যাঁহার পুণ্য বিরাট্ বক্ষে মিলেছি সকলে আসি'
এযে গো অতীত মহিমা-দীপ্ত পুঞ্জিত স্মৃতিরাশি!
ইহারি বক্ষে ছিল রে একদা অশোকের রাজধানী;
কীর্ত্তি-কিরণে রঞ্জিত এর স্নিগ্ধ-আনন খানি।
স্তম্ভ স্তূপ তাম্রশাসনে শৈল-গাত্র'পরে—
খোদিত লিপিতে আজিও ইহার অমর-কাহিনী ক্ষরে!

আজিও আসিয়া মুগ্ধ পথিক, ভারতের গিরিমূলে
দেখে সে মহিমা নীরবে দাঁড়ায়ে বিস্মিত আঁখি তুলে'!
হেথায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গঙ্গা বহিল শতেক ধারে ;—
প্রবাহ যাহার পৌছিল গিয়া দূর হিমাচলপারে!
হেথায় প্রথম ভারতে 'গিরীশে' প্রণয়-মাল্য দান ;
হেথায় সেদিন উঠিল শান্ত সাম্য নীতির তান।
হেথা 'নালন্দা-শিক্ষা ভবন' খুলিল জ্ঞানের দ্বার ;
আজিও বিশ্ব-কোবিদ্‌বৃন্দ গাহিছে মহিমা যার।
'গৃধ্রকূট পর্ব্বতে' হেথা গৌতম মুনিবর
'সুরঙ্গম্' তাঁর করিলা প্রচার লভিয়া ভারতী-বর!
বুদ্ধের পূত চরণ-চিহ্ন ধরিয়া আপন বুকে,
ওই 'রাজগৃহ' রয়েছে দাঁড়া'য়ে আজিও ঊর্দ্ধমুখে!
এ যে চাণক্য-মন্ত্রণাগার জরাসিন্ধুর দেশ,
ভারতের এ যে তীর্থক্ষেত্র—গরিমার নাহি শেষ!
দাঁড়া'য়ে আজি এ স্মৃতির শ্মশানে আপনা ধন্য মানি,
প্রেম-কমলে ভক্তি-অর্ঘ্যে বন্দি মা বীণাপাণি।

১৩। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ মহাশয় লিখিত "বাণী-বন্দনা" নামক কবিতা পাঠ—

পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপুত্রে, আসিয়াছে আজি সব ভ্রাতা,
আশিস্ করিতে স্নেহের পুত্রে, সাদরে ডাকিছে ভারতী মাতা ;
ভক্তি অর্ঘ করিয়া দান,
জননী চরণ করিব ধ্যান।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ;

নমিছে চরণে যতেক যাত্রী,
জয় মা ভারতি, বিদ্যাদাত্রি !
সাহিত্য সাধনে লভিতে সিদ্ধি, আশ্রয় কেবল সনাতন সত্য,
অর্চিত হইলে দর্শন শাস্ত্র, ভাতিবে হৃদয়ে পরম তত্ত্ব ;
মোহের শাসন নাশিবে নিত্য,
দিব্য দর্শন পুণ্য সাহিত্য।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ;
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী
জয় মা ভারতি, বিদ্যাদাত্রি !
যুক্তির দণ্ড, অমোঘ যন্ত্র, মন্থন করিতে বিজ্ঞান-সিন্ধু ;
প্রত্নতত্ত্বে, ইতিহাস ক্ষেত্রে, ভীষণ শত্রু কৈতব বিন্দু ;
জ্ঞানের সাগ্নিক আলোক রাশি,
রহিবে দীপ্ত, তিমির নাশি।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ;
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী,
জয় মা ভারতি, বিদ্যাদাত্রি !
শ্বেত চরণ পরশি মস্তে, সাদর যত্নে অর্পিব ভক্তি,
করুণা নেত্রে সেবক বৃন্দে, চাহ মা আশু সরস্বতি।
ভ্রাতৃ স্নেহের পূর্ণ ইন্দু,
করিছে স্ফীত হৃদয় সিন্ধু।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ;

নমিছে চরণে যতেক যাত্রী,
জয় মা ভারতি, বিদ্যাদাত্রী!

১৪। নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের পরলোকগমন জন্য শোক প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ক) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি-এ, (খ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, (গ) লালমোহন বিদ্যানিধি, (ঘ) গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ, (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (চ) রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, (ছ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ, (জ) বিহারীলাল গুপ্ত সি-এস, (ঝ) মোহিনীনাথ বিশি, (ঞ) হেমেন্দ্রমোহন বসু, (ট) রসিকলাল রায়।

১৫। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন। তল্লিখিত নিম্নোক্ত দুইটি প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হইল।

(ক) রমেশ-ভবন নির্ম্মাণকল্পে অর্থ সাহায্যের জন্য সমগ্র সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হউক।

(খ) স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার সাহিত্যসেবিগণের অজ্ঞাত নাই। সম্মিলনের গঠন-কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সকলেই জানেন। নিঃস্ব পরিবারগণকে রাখিয়া তিনি পরলোক-গত। তাঁহার অভাবে সাহিত্য-সম্মিলন দুর্ব্বল। তাঁহার দুঃস্থ ও নিঃস্ব পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ সাহিত্য-পরিষৎ ভিক্ষার্থী হইয়াছেন। বাঁকি-পুরের সম্মিলন ও সাহিত্যসেবিগণ এ বিষয়ে অবহিত হউন।

১৬। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনতিবিলম্বে রেজিষ্টারী করা হউক।

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের Memorandum of Association এবং Articles of Association ও নিয়মাদির খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত পাঁচ জন ব্যক্তিকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত হউক। আরও স্থির হইল যে, উক্ত পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন উপস্থিত না হইলে সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে না।

১। মাননীয় সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী সি. এস্. আই

২। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ

৩। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

৪। „ চিত্তরঞ্জন দাশ বার-য়্যাট-ল, এম-এ

৫। „ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

(খ) প্রোক্ত সমিতি খসড়াদি প্রস্তুত করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিকট দিবেন। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিলে উহা সম্মিলন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। চৈতন্য-হিন্দী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামগোপাল সিংহ চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনে উপস্থিত সমগ্র সাহিত্যসেবীকে অভিনন্দন করিলেন ও তাঁহাদিগকে উদ্যান-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিলেন।

১৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী ও বালগোবিন্দ মালবী, হিন্দী ভাষায় সকলকে সম্বোধন করিলেন।

১৯। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন এবং তাহার অধিবেশনের স্থান ও সময় বিজ্ঞাপিত হইল।

২০। সভাপতি মহাশয় প্রথম দিনের কার্য্য শেষে চলিয়া যাইবেন বলিয়া সভাপতির কার্য্যভার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপর অর্পণ করিলেন।

২১। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হইল। সভাভঙ্গের পরে চৈতন্য হিন্দীসভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উদ্যান সম্মিলনে সকলে যোগদান করিলেন।

এই দিন সন্ধ্যা ৭ টা হইতে রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত এংগ্লো-সংস্কৃত-ইন্‌ষ্টি-টিউশন গৃহে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়।

দ্বিতীয় দিবস

১০ই পৌষ, ১৩২৩, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১৬, বেলা ৮টা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার-এট-ল, এম্ এ

১। কার্য্যারম্ভ হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল,—আমাদের মহামান্য সম্রাট্ ও তাঁহার মিত্র-রাজগণের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সেই যুদ্ধে আমাদের মহামান্য সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং যাহাতে এই যুদ্ধে ইংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্জন্য মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

২। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় "বাঙ্গলার গীতিকবিতা" নামক তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (ইহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।)

৩। ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ "ইতিহাস" বক্তৃতাচ্ছলে বলিলেন। (অভিভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত হইল।)

৪। দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (ইহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল।)

বেলা অত্যধিক হওয়ায় এইখানেই সভাভঙ্গ হইল।

৫। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ অপরাহ্নে বিজ্ঞান-শাখায় পাঠ করিয়াছিলেন। (অভিভাষণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।)

এই দিন সন্ধ্যার সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ভবনে সান্ধ্য-সম্মিলন হয় এবং রাত্রি ৯টার সময় বাঁকীপুর অবৈতনিক নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয়।

দ্বিতীয় দিবস

সাহিত্য-শাখা—অপরাহ্ণ ৩-২৫ মিঃ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইল।

১। বেহার (কবিতা)— রচয়িতা—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ
পাঠক „ জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২। সাগর-সঙ্গীত (কবিতা) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গ-সাহিত্য— „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাবিনোদ

এই প্রবন্ধ পাঠের সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৪। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা— ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

৫। বাঙ্গালা প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃতি— শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ
৬। সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি— „ দেবকুমার রায়চৌধুরী

সাহিত্য-শাখা, দ্বিতীয় দিবস

প্রাতে—৯ ঘটিকা

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৭। বাঙ্গলা (কবিতা) রচয়িতা শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
পাঠক „ জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৮। নাম ও উপাধিতত্ত্ব শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যায়
৯। বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল „ রাখালরাজ রায় বি এ
১০। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাঙ্গালী
জাতি ও বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা „ চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়
১১। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক „ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

১২। বিহারে বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত
১৩। মাগধী ভাষা „ রাখালরাজ রায় বি এ
১৪। ভাষা সম্বন্ধে দু'একটি কথা „ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ
১৫। বৈষ্ণব কবিতা „ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
১৬। বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান—মৌলবি মোহাম্মদ কে চাঁদ।

প্রায় পৌনে ১০ ঘটিকার সময় সাহিত্য-শাখার কার্য্য শেষ হইল।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সাধারণ ভাবে বক্তৃতা করেন।

বিজ্ঞান-শাখা

এংগ্লো সংস্কৃত ইনষ্টিটিউশন গৃহ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস

১০ই ও ১১ই পৌষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম এল্

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

গত নবম-সম্মিলনে নির্ব্বাচিত বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিনের সভার পরে সভাপতি মহাশয় বাঁকীপুর ত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন।

১। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

২। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল,—

(ক) নিম্নবঙ্গের বিল—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম এম্ সি

(খ) এলক্যালয়েড সম্বন্ধে ধাতবীয় উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এ

(গ) দশম স্বতঃসিদ্ধ—শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

(ঘ) বিহারে কৃষির দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার বি এল্

(ঙ) বঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ্ সি এস্

(চ) পঞ্জিকা-সংস্কার—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ এ

(ছ) কাষ্ঠের উপর সূর্য্যরশ্মির প্রভাব ও তাহার ফটোগ্রাফ—শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ

(জ) পদার্থসমূহের বিজ্ঞান—শ্রীযুত পূর্ণানন্দ জ্যোতিষী

(ঞ) ঘোড়ার চৌষট্টি ঘর ভ্রমণ—শ্রীযুত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এল্

(ছ) চিহ্নিত প্রবন্ধ লেখক ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে বুঝাইয়া দেন।

৩। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয়দ্বয়গণ যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দর্শন-শাখা

দ্বিতীয় দিবস

১০ পৌষ, প্রাতে

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল।

১ম প্রবন্ধ। সন্ন্যাস ও ত্যাগ—লেখক ও পাঠক শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ।

২য় প্রবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা—লেখক ও পাঠক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্।

তাহার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যানিধি মহাশয় অবতার-তত্ত্ব, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ও সভাপতি মহাশয় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান করেন।

৩য় প্রবন্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম্মমতে দুঃখ নিবারণের উপায়—শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির

পাঠক—শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু।

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় লেখক মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

৪র্থ প্রবন্ধ। পরার্থ-পরতা—লেখিকা—শ্রীমতী মানকুমারী দাসী। লেখিকা ও পাঠক অনুপস্থিত থাকায় প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয় লেখিকাকে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

ইতিহাস-শাখা

দ্বিতীয় দিবস

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল্, এম্, আর, এ, এস্

১। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সবাল এম্, এ কর্তৃক রচিত "কল্কি-অবতারের ঐতিহাসিকত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধ, সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ইতিহাস শাখার সম্পাদক পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে পুরাণে ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে এরূপ ভাবে বর্ণনা থাকিলেও তাহা যে অতীতকালের

ঘটনা নহে এরূপ বলা যায় না। কেন না পুরাণে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাই ভবিষ্যৎকালে ঘটিবে এইরূপ ভাবে বর্ণিত আছে। গুপ্তরাজগণের রাজ্যকালে পুরাণের সংস্করণ হইয়াছিল এইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহার "A peep into Ancient Indian History" নামক নিবন্ধে লিখিয়াছেন। এরূপ হইতে পারে যে কেহ হূণদিগকে নিধন করিয়া দেশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, পরে পুরাণকারগণ তাঁহাকে অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে একবার কলির বর্ণনা দেওয়া হইল, পুনরায় যুধিষ্ঠির নারদকে কলিকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন। এই দুই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে প্রথম বর্ণনাটী প্রাচীন এবং দ্বিতীয় বর্ণনাতে অনেক পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং কলিসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পুরাণে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে "কল্কি" এই নাম "কলি" হইতে সমুদ্ভূত নহে।

২। সভাপতি মহাশয় "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়কে "গঙ্গারিডই রাজ্য" সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলিয়া তদ্‌রচিত "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থের দুইখণ্ড সভাসদ্‌বর্গের সমীপে উপস্থিত করিলেন। রায় মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া প্রবন্ধে বিবৃত বিষয়টী সংক্ষেপে মুখে বিবৃত করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, গ্রীকভাষায় গঙ্গারিড শব্দের অর্থ গাঙ্গপ্রদেশ। গ্রীক্‌ভাষা অনুসারে উক্ত শব্দের অর্থ গঙ্গারাঢ় অথবা গঙ্গাহৃদয় কখনও হইতে পারে না। শব্দ সাদৃশ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া বিনোদ বাবু তাঁহার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। কালিদাস বলিয়াছেন

"গঙ্গাস্রোতোহংস্ত-রেবু" তাহাতে গঙ্গার দ্বীপে কোথাও রাজধানী ছিল এরূপ ঠিক করিয়া বলা যায় না।

৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাজমোহন রায় মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় কহিলেন, বর্ণিত বিষয়ের প্রাচীনত্বদ্বারা গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। ঘটনা পূর্ব্বে হইয়া যায়, পরে গ্রন্থ রচিত হয়। মহাভারতের প্রাচীনত্ব এ ভাবে অনুমান করিয়া লইলে তাহা ঠিক হইবে না। কোনও গ্রন্থের বয়স এ ভাবে নির্ণীত হয় চরকসংহিতা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। "চরক' অর্থ যিনি নানা স্থানে বিচরণ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিকিৎসা করেন—itineray চিকিৎসক। সংহিতা অর্থ সংগ্রহ গ্রন্থ—collection ; সংহিতা হইলেই প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। চরক এবং সুশ্রুত-সংহিতা হইতে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত বিচার পূর্ব্বক আলোচনা করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে এ বিষয় কতক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক দিকে এখন পর্য্যন্ত কিছুই আলোচনা হয় নাই, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রসর।

৪। শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ সাহেব "শাহ এতিম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত মৌলভী মোজাম্মেল হক সাহেব "নদীয়ার পুরা কাহিনী—বেতুনা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে বর্ণিত প্রস্তরখণ্ড সমূহ সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে প্রদর্শন করিলেন। সমবেত সভ্যগণ সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা দর্শন করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী মহাশয় তদ্‌রচিত "নরসূত্র" নামক প্রবন্ধের সার অংশ সভাসমীপে মুখে ব্যক্ত করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "মধ্যযুগে সারনাথ ও বৌদ্ধ বিবাহের তিরোভাব" নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। সময়াভাব প্রযুক্ত সমগ্র প্রবন্ধ তখন পঠিত হইল না, কিন্তু সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের গৌরব বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে অবশিষ্ট অংশ পরের দিন পঠিত হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সরকার বি, এল তাঁহার "যশোহরের সন্নিকটস্থ দেবকীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ পাঠ করিলেন। সমগ্র প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৬।

পর দিবস প্রাতঃকালে আটটার সময়ে আবার ইতিহাস শাখার অধিবেশন আরম্ভ হইল।

১। শ্রীযুক্ত জয়নাথ পতি নামক একজন বিহারী ভদ্রলোক সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে তদ্‌রচিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত "Indian Period of Zoroastrian Histry" নামক প্রবন্ধের সারাংশ হিন্দী ভাষায় বিবৃত করিলেন। তাঁহার মূল কথা এই যে মহাভারত বর্ণিত যুধিষ্ঠিরই জারাথুস্ত্রনামে পারস্য দেশে "অহুর মজদাও" অর্থাৎ "অসুর মাধবের" ধর্ম্ম প্রচার করেন। পুরাণ প্রভৃতিতে যত রাজার বর্ণনা আছে তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যুর কথা আছে কিন্তু যুধিষ্ঠির শেষ বয়সে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল কুকুররূপী ধর্ম্ম; কুকুর ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে অস্পৃশ্য, কিন্তু প্রাচীন পারসীকদিগের নিকটে কুকুর পবিত্র জন্তু।

জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল ১৪২৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পাওয়া যায়, জারাথুস্ত্রের জীবিতকালও সেই সময়ে। জারাথুস্ত্র এবং যুধিষ্ঠিরের নামগত সাদৃশ্য আছে, প্রাচীন পারসীক ভাষার নিয়মানুসারে জারাথুস্ত্র নামের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা বাস্তবিক হ্রস্ব ; ইহাও তিনি যে পারসীক নহেন পরন্তু বিদেশী লোক তাহা প্রমাণ করিতেছে। জারাথুস্ত্র অহুর মজ্‌দাও এর উপাসনা পারস্যদেশে প্রচার করেন। প্রাচীন পারসীক "অহুর মজ্‌দাও" এবং সংস্কৃত "অসুর মাধব" একই কথা। মহাভারতে এবং পুরাণে মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল কার্য্য কলাপ বিবৃত আছে তাহাতে তিনি যে "অসুর" অর্থাৎ সুরবিদ্বেষী তাহার কোনও সন্দেহ নাই ; যেমন তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রদেবের পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, খাণ্ডবদাহকালে ইন্দ্রাদিদেব-গণের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনকে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিতে সাহায্য করিয়া-ছিলেন ; এই অগ্নি পারসীকগণের দেবতা। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে বেদকে অত্যন্ত হীন স্থান দিয়াছেন, যেমন যাবানর্থ উদপানে ইত্যাদি শ্লোক। এবং তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই পূজা করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন। এই সমস্ত নানা কারণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পাণ্ডবগণ মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজারূপ যে ধর্ম্ম স্বয়ং মাধবের নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই যুধিষ্ঠির পরিণত বয়সে পারস্যদেশে যাইয়া প্রচার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে ইনি একটি সম্পূর্ণ নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপপত্তির পক্ষে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সঙ্কটও আছে। যুধিষ্ঠির জারাথুস্ত্র কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশের প্রাচীন-

কালে পরস্পর সংস্রব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। প্রাচীন বৈদিক ভাষার পরবর্ত্তী ভাষা পারস্যদেশীয় গাথায় দেখিতে পাওয়া যায়, একটু পরিবর্ত্তন করিলেই গাথার ভাষা হয়। জারাথুস্ত্র কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বকালীন দুই তিনটী পশ্চিম এশিয়ার ধর্ম্মে ভারতের ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। মিতানিদিগের মধ্যে ইন্দ্র, নাসত্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়।

২। ডাক্তার আবদুল গফুর সাহেব বর্দ্ধমান জেলায় কাইগ্রাম ও রাইগ্রামের প্রত্ন-সম্পদের প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এই গ্রাম দুইটি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেমারী ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। কাইগ্রামে একটি দরগা আছে, তাহার ইষ্টক ফলক হইতে জানা যায় যে ইহা সম্রাট্ আকবরের সময়ে নির্ম্মিত। ইহার পার্শ্বেই একটি স্তূপ; ইহার ভগ্নাবশেষ প্রায় সাত আট বিঘা জমি লইয়া ছড়াইয়া আছে। মধ্য দিয়া একটি রাস্তা কাটিয়া গিয়াছে। এ স্থানে কাল পাথরের সাতটি স্তম্ভ আছে, খুব মসৃণ এবং উত্তম পালিশ করা। প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য সাত আট হাত। এ স্থানে হিন্দুযুগের মানমন্দির ছিল বলিয়া মনে হয়। খুঁড়িয়া অনুসন্ধান করা উচিত। এখানকার এক এক খানি ইটের দৈর্ঘ্য ছয় ইঞ্চি, প্রস্থ দুই ইঞ্চি এবং বেধ এক ইঞ্চি। এ স্থান হইতে এক মাইল দূরে মৌলানা সাহেবের দরগা এবং মস্জিদ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। আরবী ভাষায় লেখা আছে, তাহার পাঠ উদ্ধার হয় নাই। কিম্বদন্তী এইরূপ যে এক দরবেশ ও তাঁহার পুত্র বাঙ্গালাদেশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে বাণিজ্য করিতে এ দেশে আসিয়াছিলেন। রাইগ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে; সাধারণ লোকের মধ্যে কিম্বদন্তী এইরূপ

যে রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে খনিত হইয়াছিল। ঘাটে কাল পাথরের খণ্ড বসান আছে, এরূপ পাথর বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যায় না।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল্ বলিলেন, যে গয়া-জেলায় উমগানামক স্থানে একটি মন্দির আছে দেখিয়া বোধ হয় বৌদ্ধ যুগে নির্ম্মিত। একটি শিলালেখও আছে; কিন্তু জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে স্থিত বলিয়া এখন পর্য্যন্ত তাহা কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে নাই এবং পাঠোদ্ধারও হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিলে ভাল হয়। এই স্থান গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে মদনপুর পুলিস আউট পোষ্টের নিকটে, পানারগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে একা করিয়া যাওয়া যায়। দেউ নামক স্থানে প্রাচীন সূর্য্যমন্দির এবং শিলালেখ আছে। মন্দিরের সিঁড়িতে সাতটি ধাপ আছে। মন্দিরে প্রবেশপথ মাত্র একটি, পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের খিলানটি পিরামিডের আকৃতি। মন্দির মধ্যে বেদীর উপরে সূর্য্যের মূর্ত্তি, পায়ে বুটজুতার মত রহিয়াছে, নীচে সাতটি স্ত্রীমূর্ত্তি। গয়ার উনিশ মাইল পশ্চিমে, ইস্‌লামপুর ষ্টেশনের নিকটে দন্তশিরপুর নামক স্থান আছে। সেখানে "বাথানী" নামক একটি স্থান আছে; কিম্বদন্তী শুনিয়া মনে হয় যে সেখানে একটি বৌদ্ধ পশুচিকিৎসালয় ছিল। সাউথ বিহার রেলওয়ের গুরপা ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে শেরদিলা নামক স্থানে বৌদ্ধযুগের বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্বদিনের অর্দ্ধপঠিত প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম কেবল বৌদ্ধদিগের দ্বারা দেশে প্রচারিত হইয়াছে ইহা ঠিক কথা নহে। সেই সময়ে সমগ্র সমাজের হীনাবস্থা, তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরে ম্যাজিক

এবং তন্ত্রমন্ত্রের মোহ সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যখন সমাজের স্তরে বিষ প্রবেশ করিল, তখন কেহই প্রতিবেশীর ঘর পুড়িল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। বৌদ্ধ সমাজে মাত্র এই দোষ প্রবেশ করে নাই, সমগ্র সমাজের মধ্যেই প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তান্ত্রিক ধর্ম্ম, ম্যাজিকের ধর্ম্ম; incantations অর্থাৎ তন্ত্র মন্ত্রদ্বারা দেবতাকে জোর করিয়া কাজ করাইয়া লইতে হইবে। ইহার অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রাচীন। ইহা চীন প্রভৃতি দেশে মঙ্গোলিয়ান জাতিগণের মধ্যে ও দ্রবিড় জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদেও একরকম আছে—পিতৃগণ, ঋষিগণ ও দেবতাদিগের পুনরুজ্জীবন এই তিন দিকে বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করা উচিত। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম religion নহে, religion মোক্ষশাস্ত্র, পরলোক ঈশ্বর প্রভৃতি লইয়া আলোচনা; পক্ষান্তরে ধর্ম্ম, conduct, শীল। শীল লইয়া বৌদ্ধেরা থাকিতেন। বৌদ্ধধর্ম্ম একটা মতবাদ, বৌদ্ধগণ সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন। কেহ বৌদ্ধমত গ্রহণ করিলে কেবল মতের পার্থক্য হইত, তাহার জাতি যাইত না, কিম্বা সে সমাজচ্যুত হইত না। বিবাহাদি অনুষ্ঠান এক রূপই হইত। একই সমাজের মধ্যে মতের পার্থক্য হইত, তর্ক হইত, কিন্তু কেহই সমাজের বাহির হইত না। তাহার পরে যখন অবনতি হইল, তখন সমগ্র সমাজেরই অবনতি হইল। ক্ষয় সমগ্র সমাজের ভিতর দিয়াই আসিয়াছে। কিন্তু যাহার মধ্যে যাহা ভাল ছিল তাহা সুরক্ষিত রহিয়াছে, কিছুই একবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। মুসলমান-দিগের অধিকার কালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে এত পার্থক্য হইয়াছে। মুসলমানদিগের একটা নূতন ভাব, তাহাদিগের Religion of Salvation। বিদেশীয়দিগের সহিত ধর্ম্মমতের প্রভেদ ও বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। এই সকল বিষয়ে ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য

যে তিনি ভাবুকতা দ্বারা, emotion দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিচার না করেন; ভিন্ন মতের প্রতি রূঢ়, কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা না হয় এ সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। স্থির, নিরপেক্ষ মন না হইলে সত্যদর্শনের ব্যাঘাত হয়। স্থির ভাবে বিচার পূর্ব্বক অতীত ঘটনা গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটনাই ইতিহাস, reflections, মন্তব্যসমূহ ইতিহাস নহে।

এবারকার সম্মিলনে অনেক নূতন ভাব এবং অনেক নূতন স্থানের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। দেশের সর্ব্বত্রই প্রাচীন তথ্যের অনুসন্ধানে একটা দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা বড়ই আশাপ্রদ। এই সমস্ত বিষয় লইয়া অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে ভবিষ্যৎ সম্মিলনীতে অনেক ভাল জিনিস পাওয়া যাইবে। সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরপেক্ষ বিদ্বেষহীন ইতিহাস আলোচনা চলিতে থাকুক, ইহা সর্ব্বতো-ভাবে প্রার্থনীয়।

৫। নিম্নলিখিত প্রবন্ধকয়টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল :—

(ক) শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত "দিনগণনার আদিতত্ত্ব"।

(খ) " গুণালঙ্কার মহাস্থবির লিখিত "বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত-জীবনী"।

(গ) " অসিতকুমার হালদার লিখিত "ভারতের স্থাপত্য"।

(ঘ) " কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী লিখিত "একচক্রা"।

(ঙ) " যোগেশচন্দ্র মিত্র লিখিত "জীবনবীমা"।

তৃতীয় দিন

সাধারণ-সভা

১১ই পৌষ, ১৩২৩, মঙ্গলবার, সময় বেলা ১০টা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ

১। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮ম নিয়ম। এই সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য পরিচালনের জন্য প্রতি বৎসর অনূ্যন ৬০ জনকে লইয়া সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসর সম্মিলনের শেষ বৈঠকে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

ইহার পর নিম্নোক্ত অংশ যোগ করিতে হইবে।—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ সাধারণ সম্মিলন-সমিতির সভ্য হইবেন।"

৯ম নিয়ম। "সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উক্ত সদস্যগণ অথবা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা, সম্মিলনের সেই অধিবেশনেই কিংবা তাহার পর এক মাসের মধ্যে" এই অংশের স্থলে—

"উক্ত প্রকারে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ যথাসম্ভব শীঘ্র" এই নূতন অংশ সংযুক্ত হইবে।

৯ম নিয়মের পরে নিম্নোক্ত নূতন নিয়ম বসিবে—

"দ্রষ্টব্য—যদি এই নির্ব্বাচিত দশ জনের মধ্যে কেহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য থাকেন, তবে তাঁহার স্থলে অপর একজন সভ্য সম্মিলন পরিচালন-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।"

নবম (খ) নিয়মের—

"তাঁহাদের অভাব হইলে" স্থলে "তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে" হইবে।

দশম নিয়মের "তিন মাস মধ্যে" এই অংশ বাদ দিতে হইবে।

১২শ নিয়ম। অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক যাঁহারা প্রবন্ধ রচনার জন্য আহূত হইবেন বা তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রচনা

এবং সংগৃহীত বিষয়াদি সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

ইহার পর নিম্নোক্ত নূতন অংশ যোগ করিতে হইবে,—

"এবং তাঁহারা প্রবন্ধের সহিত সংক্ষেপে প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া ঐ প্রবন্ধের সহিত পাঠাইবেন।"

১৫শ (গ) নিয়ম। ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব, প্রত্ন-তত্ত্ব, ভূগোল, প্রভৃতি)" হইবে।

১৫শ (ঘ) নিয়ম। গণিত ও বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসা-বিদ্যা ও কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি।)" হইবে।

২। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতি এবং বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক সমিতি, এতদুভয়ের সহিত সংঘর্ষ না হইয়া যাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের দিন ধার্য্য হয়, ইহার ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, পরিচালন-সমিতি এবং যে স্থানে যে বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তথাকার অভ্যর্থনা-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

অনুমোদক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

৩। মানভূম জেলার অন্তর্গত ধানবাদ মহকুমায় যাহাতে পূর্ব্ববৎ শিক্ষার্থিগণের জন্য বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনাদি করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালন-সমিতির উপর দিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বিএল

সমর্থক— „ ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল

৪। এ দেশের উচ্চ শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য আপাততঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই মন্তব্যটি বিচার করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র সহ মন্তব্যটি প্রেরিত হউক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বি এ শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রস্তাবক—মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম এ, বি এল

সমর্থক— „ হেমচন্দ্র বসু এম এ, বি এল

৫। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব তিনটি উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল।

(১) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব না জন্মিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা ও পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবের শিক্ষা-বিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সেই সেই প্রদেশে বাঙ্গালা শিক্ষার্থী ছাত্রদের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হউক।

(ক) এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু (কটক), মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ (বিহার), শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পাঞ্জাব), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ (আসাম) ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (কলিকাতা) মহাশয়গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়

এই শাখা-সমিতির সম্পাদক হউন এবং আবশ্যক হইলে সমিতি স্বীয় সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৬। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে পাঠ্য পুস্তকাদিতে ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বঙ্গভাষার বিশুদ্ধি যাহাতে রক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়গণের উপর ভার দেওয়া হউক এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক যে, তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবধারণ করেন, তাহা তাঁহারা সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিকে অবগত করান ;

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র

সমর্থক— „ রামলাল সিংহ

৭। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

কলিকাতা

আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
মৌলবি শিরিজুজমান
মৌলবি মহম্মদ আকরাম খাঁ
মৌলবি নুরমহম্মদ

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু
" বিপিনচন্দ্র পাল
" চিত্তরঞ্জন দাশ
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু
" শশধর রায়
" যতীশচন্দ্র ঘোষ
" জলধর সেন

হাওড়া

" দুর্গাদাস লাহিড়ী
" অক্ষয়কুমার সরকার
" অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" প্রমথনাথ সেন
" আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবিশ

হুগলী

" অক্ষয়চন্দ্র সরকার
" কুমার ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়
" লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নদীয়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়বাহাদুর
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন
" হেমচন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" চন্দ্রশেখর কর
মুন্সী মহম্মদ জমীরুদ্দিন
" আশুতোষ রায়
মোজাম্মেল হক

খুলনা

" কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" অশ্বিনীকুমার সেন
" জগৎপ্রসন্ন রায়
" যতীন্দ্রমোহন সেন
মোহম্মদ খয়রাতউল্লা

বরিশাল

" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত
রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

ফরিদপুর

" আনন্দনাথ রায়
মৌলবি রওশন আলী চৌধুরী

ঢাকা

অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র মজুমদার
" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
" ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ অবনীকান্ত সেন

২৪ পরগণা

মৌলবি মোহম্মদ কে, চাঁদ
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
মৌলবি মোহম্মদ সহীহুল্লাহ
শ্রীযুক্ত হরবিলাস সিকদার
„ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
„ সতীশচন্দ্র ঘটক

বর্দ্ধমান

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর
শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ
„ সন্তোষকুমার বসু
„ শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ সরকার
„ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
„ ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়

বীরভূম

মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শিবরতন মিত্র
„ তারকচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া

„ উপেন্দ্রনাথ দাস
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মেদিনীপুর

রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু
„ মহেন্দ্রনাথ দাস
„ সত্যেন্দ্রনাথ বসু
„ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ ভাগবতচন্দ্র দাস
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব

মুর্শিদাবাদ

মাননীয় মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, এস, আই
অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়
যশোহর
" রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর
মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী
রায় " যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর
কুমার " সতীশকণ্ঠ রায়
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" হীরালাল ভট্টাচার্য্য
" শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়
" অবিনাশচন্দ্র সরকার
" গিরিজাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
" কেদারনাথ ভারতী
" শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ
হবিবর রহমান
মুন্সী মহম্মদ কাসেম
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাছাড়
ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য
জগন্নাথ দেব
গৌহাটী
অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
" বনমালী বেদান্ততীর্থ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী
অধ্যাপক ভুবনমোহন সেন
শ্রীযুক্ত কাশীচরণ সেন
অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
গোয়ালপাড়া
শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া
" দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কুচবিহার
কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ
শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য
চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ
আব্দুল হালিম
মৌলবী দীন মহম্মদ
রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর
সেখ রেয়াজুদ্দিন আহাম্মদ
রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সেখ ফজলল্ করিম
খান বাহাদুর মৌলবি তসলিমুদ্দিন

ময়মনসিংহ

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
" কেদারনাথ মজুমদার
নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী
সেক আবদুল জব্বর

ত্রিপুরা

কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা
কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেবশর্ম্মা
" অনুকূলচন্দ্র রায়
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" রজনীনাথ নন্দী

নোয়াখালী

" মহেন্দ্রকুমার ঘোষ
" আবদুল ওয়াহেদ
কুমার আবদুল বারিক

চট্টগ্রাম

রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত
" শশাঙ্কমোহন সেন
" বিপিনবিহারী নন্দী
" ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
মুনশী আবদুল করিম
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

" সতীশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব
" অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
" অচ্যুতচরণ চৌধুরী

বগুড়া

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু
" বেণীমাধব চাকী
" সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" মৌলবি মিয়াজুদ্দিন
" যতীন্দ্রমোহন রায়

পাবনা

" সতীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী
„ সীতানাথ অধিকারী

দিনাজপুর

মহারাজ সার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ
রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন
„ রামচন্দ্র সেন
„ মৌলবী একেনুদ্দীন আহাম্মদ

রাজসাহী

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
„ রমাপ্রসাদ চন্দ
„ রাধাগোবিন্দ বসাক
„ পঞ্চানন নিয়োগী
„ গিরিজামোহন সান্যাল
নজীবর রহমান

মালদহ

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত
„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
„ বিপিনবিহারী ঘোষ

পূর্ণিয়া

„ জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
„ মহাশয় তারকনাথ ঘোষ

কটক

শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর
„ বিপিনবিহারী সেন

মানভূম

শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ
„ ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত

বাঁকীপুর

রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার
„ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
„ রাখালরাজ রায়
„ নরেশচন্দ্র সিংহ
„ রায় সাহেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ মথুরানাথ সিংহ
„ রামলাল সিংহ

কাশী

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম সিংহ
" মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	" সরোজনাথ বাগচী
গয়া	মীরাট
" প্রকাশচন্দ্র সরকার	" বিমলেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায়
মুঙ্গের	" নবকৃষ্ণ রায়
" হেমচন্দ্র বসু	" কালীপদ বসু
রাঁচী	" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
" প্রমথনাথ বসু	কাণপুর
দিল্লী	" সুরেন্দ্রনাথ সেন
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	" শচীন্দ্রনাথ ঘোষ

৮। ঢাকা সাহিত্য-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুখেন্দুরঞ্জন ঘোষ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলনকে ঢাকায় আহ্বান করিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় জানাইলেন যে, মুঙ্গেরের পাবলিক্ প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বসু মহাশয় মুঙ্গেরে সম্মিলনকে আহ্বান করিলেন।

১০। ধন্যবাদের প্রস্তাব—

(ক) বিহারবাসীর পক্ষ হইতে—

(খ) প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ হইতে—

	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
	" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	" মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
	" মৌলবী আমানত উল্লা আহাম্মদ
" মথুরানাথ সিংহ	" ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
" রামলাল সিংহ	" চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহাশয় রচিত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত গীত হইলে সম্রাটের জয় ঘোষণা করিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

দিতে গো বিদায় আজি বাজিছে দারুণ মনে !
ছাড়িতে কি চাহে প্রাণ পেয়ে আপনার জনে ?
যা ছিল বলিতে কথা,
বুক-ভরা ব্যাকুলতা,
কিছু ত হ'ল না বলা দুদিনের শুভক্ষণে।
পুরিল না মনসাধ,
ক্ষম সখা অপরাধ,
ত্রুটি যত সেবিতে গো তোমা সবে প্রাণপণে।
বঙ্গভাষী প্রবাসীর,
উপহার আঁখিনীর,
ল'য়ে যাও, মনে রেখ এ মিলন তব সনে।

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের তালিকা।

(ইঁহারা সম্মিলনের নিয়মানুসারে ২৲ করিয়া ফি দিয়াছেন)

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ নন্দী।
„ অন্নদাকৃষ্ণ সিংহ।
„ অন্নদাপ্রসাদ দত্ত।
ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকি
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ।
„ গোলকেন্দ্রনাথ দে।
„ চিত্তরঞ্জন দাশ।
„ জগদ্বন্ধু দত্ত।
„ জ্ঞানাঞ্জন পাল।
„ দেবপ্রসাদ ঘোষ।
„ ননিগোপাল দে।
„ ননিগোপাল মজুমদার।
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিপিনচন্দ্র পাল।
„ মোহিনীমোহন সেন।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।
যতীশচন্দ্র ঘোষ।
যোগেশচন্দ্র মিত্র।
রমেশচন্দ্র মজুমদার।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
রামকমল সিংহ।
ললিতচন্দ্র মিত্র।
লাডলীমোহন মিত্র।
শরৎচন্দ্র ঘোষ।
শশধর রায়।
শিশিরকুমার ভাদুড়ী।
সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
সুরেন্দ্রনাথ কুমার।
সুরেশচন্দ্র দেব।
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কাশী।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়।
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কুচবিহার।

চৌধুরী আমানাৎউল্লা খাঁ।

খুলনা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন।
„ রঘুনন্দন গোস্বামী।
„ হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

গয়া।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
„ বৃন্দাবন সরকার।

গৌহাটী।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।

চব্বিশ পরগণা।

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দত্ত।

দ্বারবঙ্গ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ।
„ রাখালচন্দ্র সিংহ।

ধানবাদ।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত।

নদীয়া।

শ্রীযুক্ত মুঃ মোজাম্মল হক।

ডিহরী।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ঢাকা।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সরকার।

বক্সার।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী।

বগুড়া।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সরাফ।

বরিশাল।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী।

বৰ্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত মৌঃ আবদুল লতিফ।
„ করালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ নিখিলনাথ রায়।
„ মঃ নবাব দান।
„ ভোলানাথ ভঞ্জ।
„ চণ্ডিদাস মজুমদার।

বীরভূম।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার।
„ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাঁকিপুর।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়।

ভাগলপুর।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র।
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
„ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মজফরপুর।

শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ সেন।
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।
„ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন।
„ ভূষণচন্দ্র নাথ।

মুঙ্গের।

শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।
„ সৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত।
„ হেমচন্দ্র বসু।

মুর্শিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ পান্নালাল সিংহ।

মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়।
„ মোহিনীমোহন দাস।
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ।
„ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার।

যশোহর।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত মাননীয় কিশোরীমোহন চৌধুরী
„ গিরিজামোহন সান্যাল।
„ পঞ্চানন নিয়োগী।
„ বিনোদবিহারী রায়।
„ মতিলাল ইন্দ্র।
„ শশিকিশোর চঙ্গদার।

হাওড়া।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
„ গিরিজাকুমার বসু।
„ ধ্রুবকুমার পাল।
„ অনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ জীবেন্দ্র দাস।

এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ, আরা, হাজারীবাগ, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, পুষা, মতিহারী, মধুবাণী, সম্বলপুর, প্রভৃতি স্থান হইতে সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়াছিলেন।